সাধারণ ছুটি

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিবস ও জাতীয় শিশুদিবস
স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস
মে দিবস
বৌদ্ধ পূর্ণিমা (বৈশাখী পূর্ণিমা)
জুমাতুল বিদা
ঈদুল ফিতর
ঈদুল আযহা
জাতীয় শোক দিবস
শুভ জন্মাষ্টমী
শ্রী শ্রী দুর্গাপূজা (বিজয়া দশমী)
ঈদ-ই-মিলাদুন্নবি (সা.)
বিজয় দিবস
যিশু খ্রিষ্টের জন্মদিবস (বড় দিন)

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল দিন। বর্তমানে এটি শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে উদযাপিত হয়। একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালি জনগণের ভাষা আন্দোলনের মর্মন্তুদ ও গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতিবিজড়িত দিন। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাংলাকে বাদ দিয়ে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দিলে বাঙালিরা বাংলা ভাষার সমমর্যাদার দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। আন্দোলনের এক পর্যায়ে ১৯৫২ সালের এই দিনে (৮ই ফাল্গুন, ১৩৫৮) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ১৪৪ ধারা অমান্য করে রাজপথে বেরিয়ে এলে পুলিশ তাদের ওপর গুলি চালায় । এ মর্মান্তিক ঘটনায় রফিক, জব্বার, শফিউল, সালাম ও বরকতসহ আরো অনেকে শহিদ হন। এ আন্দোলনের ফলে শাসকগোষ্ঠী শেষ পর্যন্ত বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে বাধ্য হয়। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে এবং এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের। তাই বাঙালিরা এ দিনটিকে শহিদ দিবস হিসেবে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করে।

বিশ্বের সকল জাতিগোষ্ঠীর মাতৃভাষাকে রক্ষার উদ্দেশ্যে ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে ইউনেস্কো একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে উদযাপনের ঘোষণা প্রদান করে। ২১শে ফেব্রুয়ারির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করার আগে, দিনটিকে মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালনের জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে দাবি শোনা যায়। তবে এ বিষয়ে প্রথম সফল উদ্যোক্তা হলেন কানাডার বহুভাষিক ও বহুজাতিক মাতৃভাষা-প্রেমিকগোষ্ঠী। তাদের মধ্যে অন্যতম দুই বাঙালি রফিকুল ইসলাম এবং আব্দুস সালাম প্রাথমিক উদ্যোক্তা হিসেবে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণার আবেদন জানিয়েছিলেন জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানের কাছে ১৯৯৮ সালের ২৯শে মার্চ। সেখানে তাঁরা বলেন যে, বাঙালিরা তাদের মাতৃভাষাকে রক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সেটা ছিল তাদের ভাষার অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। কাজেই মাতৃভাষা দিবসের দাবিটি খুবই ন্যায়সংগত। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রাজ্ঞ ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব উত্থাপন করে এবং এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর প্যারিস অধিবেশনে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং ২০০০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি থেকে দিবসটি জাতিসংঘের সদস্যদেশসমূহে যথাযথ মর্যাদায় পালিত হচ্ছে। বাংলাদেশের উত্থাপিত প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১০ সালের ২১শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৫তম অধিবেশনে “প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করবে জাতিসংঘ” মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মে মাসে ১১৩ সদস্যবিশিষ্ট জাতিসংঘের

তথ্যবিষয়ক কমিটিতে প্রস্তাবটি সর্বসম্মতভাবে পাস হয়। ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারি বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয়।

১৯৫২ সাল থেকে প্রতিবছর এ দিনটি জাতীয় শহিদ দিবস হিসেবে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় ২১শে ফেব্রুয়ারি রাত ১২টা এক মিনিটে প্রথমে রাষ্ট্রপতি এবং পরে একাদিক্রমে প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, শিক্ষকবৃন্দ, ঢাকাস্থ বিভিন্ন দূতাবাসের কর্মকর্তাবৃন্দ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন এবং সর্বস্তরের জনগণ নগ্ন পায়ে হেঁটে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। এ সময় আবদুল গাফফার চৌধুরী রচিত ও আলতাফ মাহমুদ সুরারোপিত 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি' গানের করুণ সুর বাজতে থাকে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর একুশে ফেব্রুয়ারি সরকারি ছুটির দিন হিসেবে ঘোষিত হয়। এদিন শহিদ দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে সরকারি ও বেসরকারি রেডিও, টেলিভিশন চ্যানেল এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। দেশের সংবাদপত্রগুলিও বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিবস ও জাতীয় শিশুদিবস

প্রতি বছর ১৭ই মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস পালন করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ, ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার (বর্তমান জেলা) টুঙ্গীপাড়া গ্রামে। তাঁর পিতা শেখ লুৎফর রহমান ও মাতা সায়েরা খাতুন। কৈশোর থেকেই তাঁর মধ্যে নেতৃত্বের গুণ বিকশিত হতে দেখা যায়। বি.এ. পড়ার সময় ১৯৪৬ সালে তিনি কলকাতা ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৪৯ সালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ছিলেন তিনি। ১৯৫৩ সালে শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং ১৯৬৬ সালে সভাপতি নির্বাচিত হন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পথে ১৯৬৬-র ছয় দফা, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন, সর্বোপরি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানের মাধ্যমে বাঙালির হাজার বছর লালিত স্বাধীনতার স্বপ্নকে মূর্ত করে প্রতিষ্ঠা করেন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র। এজন্য তিনি বাংলাদেশের জাতির জনক। ১৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন বাঙালির আনন্দের দিন। যথাযোগ্য রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দিনটি পালিত

হয়। শিশুদের বঙ্গবন্ধুর মহান জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে এদিনটিকে জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে পালনের ঘোষণা দেওয়া হয়।

সারা বিশ্বে 'বিশ্ব শিশু দিবস' পালন করা হয় ২০শে নভেম্বর এবং 'আন্তর্জাতিক শিশু দিবস' পালিত হয় ১লা জুন। ১৯৯৬ সালে প্রথম বাংলাদেশে জাতীয় শিশু দিবস পালন করা হয়। বাংলাদেশে জাতীয় শিশু দিবস পালিত হয় ১৭ই মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিনে। শিশুদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর ভালোবাসা ছিল অপরিসীম। তাই তাঁর জন্মদিনকে শিশুদের জন্য উৎসর্গ করে জাতীয় শিশু দিবস ঘোষণা করা হয়। এদিনে আমাদের প্রিয় বাংলাদেশকে শিশুদের জন্য নিরাপদ আবাসভূমিতে পরিণত করার নতুন শপথ নিতে হবে সবার। শেখ মুজিবুর রহমানের কর্ম ও রাজনৈতিক জীবন অসামান্য গৌরবের। তাঁর এ গৌরবের ইতিহাস থেকে প্রতিটি শিশুর মাঝে চারিত্রিক দৃঢ়তার ভিত্তি গড়ে উঠবে এটিই জাতীয় শিশু দিবসের মূল প্রতিপাদ্য।

বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন এবং জাতীয় শিশু দিবস পালনে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। তাছাড়া দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে বাংলাদেশ টেলিভিশন, বেতারসহ বেসরকারি বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল প্রচার করে বিশেষ অনুষ্ঠানমালা। সংবাপত্রগুলো বিশেষ ক্রোড়পত্র ও নিবন্ধ প্রকাশ করে। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আয়োজন করা হয় রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার। পাশাপাশি বিভিন্ন মসজিদে মোনাজাত, মিলাদ ও দোয়া মাহফিল এবং মন্দির, গির্জা, প্যাগোডাসহ অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনালয়ে বিশেষ প্রার্থনা সভা আয়োজিত হয়।

স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস

প্রতি বছর ২৬শে মার্চ উদযাপিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস। পাকিস্তানি দুঃশাসনের বেড়াজাল ছিন্ন করে এদিন স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে বাংলাদেশ নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করে। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সৈন্যদের নির্বিচার গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হওয়ার পর ২৬শে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়। ১৯৭২ সালের ২২শে জানুয়ারি প্রকাশিত এক প্রজ্ঞাপনে এই দিনটিকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস হিসেবে উদযাপন করার সিদ্ধান্ত হয় এবং সরকারিভাবে এ দিনটিতে ছুটি ঘোষণা করা হয়। ১৯৮০ সালের ৩রা অক্টোবর সরকার দিনটিকে জাতীয় দিবস হিসেবেও উদযাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান সরকার গভীর রাতে পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) নিরীহ জনগণের ওপর হামলা চালায়। ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হন। গ্রেপ্তার হবার পূর্বে ২৫শে মার্চ রাত ১২টার পর (২৬শে

মার্চের প্রথম প্রহরে) তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাংলার মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানসহ সর্বস্তরের জনগণ জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধভাবে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত দীর্ঘ ৯ মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহিদের আত্মত্যাগ ও দুই লক্ষ মা বোনের সম্ভ্রমহানির বিনিময়ে অর্জিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা। বিশ্বমানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস বেশ বর্ণাঢ্যভাবে উদযাপন করা হয়। ৩১ বার তোপধ্বনির মধ্য দিয়ে দিবসের শুভ সূচনা করা হয়। জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে দিবসের কর্মসূচি শুরু হয়। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন ভবনসমূহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত শহরের প্রধান প্রধান সড়ক ও সড়কদ্বীপসমূহ জাতীয় পতাকা ও বিভিন্ন রঙের পতাকা দিয়ে সজ্জিত করা হয়। জাতীয় স্টেডিয়ামে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের সমাবেশ, কুচকাওয়াজ, ডিসপ্লে ও শরীরচর্চা প্রদর্শন করা হয়। এই দিনটিতে সরকারি ছুটি থাকে। পত্রিকাগুলো বিশেষ ক্রোড়পত্র বের করে। বেতার ও টেলিভিশন চ্যানেলগুলো বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করে।

মে দিবস

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস মে দিবস নামে অভিহিত হয়। প্রতি বছর ১লা মে তারিখে বিশ্বব্যাপী উদযাপিত হয়। এটি আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের উদযাপন দিবস।

বিশ্বের কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও দাবি আদায়ের স্মারক মহান ‘মে দিবস’। ১৮৮৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের হে মার্কেটের শ্রমিকেরা উপযুক্ত মজুরি আর দৈনিক আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। কল-কারখানা তখন গ্রাস করছিল শ্রমিকের গোটা জীবন। অসহনীয় পরিবেশে প্রতিদিন ১৬ ঘণ্টা কাজ করতে হতো। ৮ ঘণ্টার কর্মদিবসের দাবিতে শুরু হওয়া আন্দোলনের সময় ১৮৮৬ সালের ১লা মে শ্রমিকেরা ধর্মঘট আহবান করে। প্রায় তিন লাখ মেহনতি মানুষ ওই সমাবেশে অংশ নেয়। আন্দোলনরত বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের রুখতে গিয়ে একসময় পুলিশ বাহিনী শ্রমিকদের মিছিলে এলোপাতাড়ি গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে ১১জন নিরস্ত্র শ্রমিক নিহত হন, আহত ও গ্রেফতার হন আরো অনেক শ্রমিক। পরে প্রহসনমূলক বিচারের মাধ্যমে গ্রেফতারকৃত শ্রমিকদের মধ্য থেকে ছয়জনকে আন্দোলনে অংশ নেয়ার অপরাধে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। কারাগারে বন্দিদশায় এক শ্রমিক নেতা আত্মহনন করেন।

এতে বিক্ষোভ আরো প্রকট আকারে সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। আন্দোলনরত শ্রমিকদের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয় যুক্তরাষ্ট্র সরকার। ১৮৮৯ সালের ১৪ই জুলাই ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে '১লা মে'-কে শ্রমিক দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। পরবর্তী বছর অর্থাৎ ১৮৯০ সাল থেকে ১লা মে বিশ্বব্যাপী পালিত হয়ে আসছে, যা 'মে দিবস' বা 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস' নামে পরিচিত।

মে দিবস আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি লাভের মাধ্যমে সারা বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণির ন্যায্য অধিকার আদায়ের পথ সুগম হয়েছে। মালিক-শ্রমিক সম্পর্কের ওপর এ দিবসের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। এর প্রভাবে শ্রমিকদের দৈনিক কাজের সময় ১৬ ঘণ্টা থেকে নেমে আসে ৮ ঘণ্টায়। বিশ্বের সব দেশের শ্রমিকেরা এর মাধ্যমে তাদের শ্রমের উপযুক্ত মর্যাদা পেতে শুরু করে। নিজেদের অধিকার আদায়ে তারা এগিয়ে যায় সামনে। মেহনতি মানুষ মুক্তি পেতে শুরু করে তাদের শৃঙ্খলিত জীবন থেকে। বিশ্বের ইতিহাসে সংযোজিত হয় সামাজিক পরিবর্তনের আরেকটি নতুন অধ্যায়।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শ্রমজীবী মানুষ এবং শ্রমিক সংগঠনসমূহ রাজপথে সংগঠিতভাবে মিছিল ও শোভাযাত্রার মাধ্যমে দিবসটি পালন করে থাকে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় ৮০টি দেশে ১লা মে উদযাপন হয়।

বুদ্ধ পূর্ণিমা (বৈশাখী পূর্ণিমা)

বুদ্ধ পূর্ণিমা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে মহামানব সিদ্ধার্থের জীবনের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল বলে দিনটি 'বুদ্ধ পূর্ণিমা' নামে খ্যাত। খ্রিষ্টপূর্ব ৬২৩ অব্দের এদিনে গৌতম বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন, ৫৮৮ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের এদিনে তিনি সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে জগতে বুদ্ধ নামে খ্যাত হন এবং ৫৪৩ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের এদিনে তিনি মহাপরিনির্বাণ লাভ (মৃত্যুবরণ) করেন। সিদ্ধার্থের বুদ্ধত্ব লাভের মধ্য দিয়েই জগতে বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তিত হয়।

বৌদ্ধ ধর্মকাহিনী থেকে জানা যায় যে, পূর্বজন্মে বোধিসত্ত্ব সকল পারমি পূরণ করে সন্তোষকুমার নামে যখন স্বর্গে অবস্থান করছিলেন, তখন দেবগণ তাঁকে জগতের মুক্তি এবং দেবতা ও মানুষের নির্বাণ পথের সন্ধান দানের জন্য মনুষ্যকুলে জন্ম নিতে অনুরোধ করেন। দেবতাদের অনুরোধে বোধিসত্ত্ব সর্বদিক বিবেচনাপূর্বক এক আষাঢ়ী পূর্ণিমায় স্বপ্নযোগে মাতৃকুক্ষিতে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেন এবং পরবর্তী এক শুভ বৈশাখী পূর্ণিমায় হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত শাক্যরাজ্যে রাজপুত্ররূপে জন্মলাভ করেন। তাঁর জন্ম হয়েছিল লুম্বিনী কাননের শালবৃক্ষ ছায়ায় উন্মুক্ত আকাশতলে। তাঁর নিকট জাতি, শ্রেণি ও গোত্রের কোনো ভেদাভেদ ছিল না। তিনি মানুষকে মানুষ এবং প্রাণীকে প্রাণিরূপেই জানতেন এবং সব প্রাণসত্তার মধ্যেই যে কষ্টবোধ আছে তা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি

করতেন। তাই তিনি বলেছিলেন ‘সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখীতত্তা’ জগতের সব প্রাণী সুখী হোক। এই মর্মচেতনা জাগ্রত করা এবং এই পরম সত্য জানার জন্য তিনি ২৯ বছর বয়সে সংসার ত্যাগ করেন। সত্যের সন্ধানে পরিভ্রমণ করতে করতে এক সময় তিনি গয়ার উরুবেলায় (বুদ্ধগয়া) গিয়ে নিবিষ্টচিত্তে সাধনামগ্ন হন। দীর্ঘ ছয় বছর অবিরাম সাধনায় তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন। সেদিনও ছিল বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথি।

বুদ্ধত্ব লাভের পর বুদ্ধদেব জীবের মুক্তি কামনায় ‘ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র’ নামে জীবনের সর্ববিধ ক্লেশ থেকে মুক্তির উপায় আবিষ্কার করেন। তিনি চতুরার্যসত্য নামে খ্যাত এক তত্ত্বে জীবনে দুঃখের উৎপত্তি ও দুঃখভোগের কারণ এবং দুঃখ থেকে মুক্তির পথ নির্দেশ করেন। মুক্তির এই পথনির্দেশনাকে বলা হয় আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ বা আটটি আর্যপথ। দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর তিনি প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করে তাঁর এই ধর্মতত্ত্ব প্রচার করেন। রাজা-প্রজা, ধনী-নির্ধন, কুলীন-অন্ত্যজ সর্বশ্রেণির মানুষের নিকট মুক্তির কথা তুলে ধরে তিনি জগতে এক নতুন ধর্মাদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন। আশি বছর বয়সে হিরণ্যবতী নদীর তীরে কুশিনগরের জোড়া শালবৃক্ষের মূলে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগপূর্বক তিনি মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। এই মহাপরিনির্বাণ লাভের ক্ষণও ছিল বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথি।

বুদ্ধ পূর্ণিমার দিনে বৌদ্ধরা বুদ্ধপূজাসহ পঞ্চশীল, অষ্টশীল, সূত্রপাঠ, সূত্রশ্রবণ, সমবেত প্রার্থনা এবং নানাবিধ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বিবিধ পূজা ও আচার-অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বিবিধ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। বৌদ্ধ বিহারগুলিতে বুদ্ধের মহাজীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনাসহ ধর্মীয় সভার আয়োজন করা হয়। এই পূর্ণিমাকে ঘিরে বৌদ্ধবিহারগুলোতে চলে তিনদিনব্যাপী নানামুখী অনুষ্ঠান। বৌদ্ধধর্মীয় পর্ব হিসেবে এ দিনে সাধারণ সরকারি ছুটি থাকে।

জুমাতুল বিদা

জুমাতুল বিদা মুসলমানদের জন্য এক মহিমান্বিত দিবস। জুমাতুল বিদা আরবি শব্দ, এর অর্থ সমাপনী সম্মিলন। সিয়াম সাধনার মাস পবিত্র রমযানের বিদায়ী বা শেষ শুক্রবারকে জুমাতুল বিদা বলা হয়। হিজরি ও চান্দ্র মাসসমূহের মধ্যে রমযান সর্বশ্রেষ্ঠ, আবার সপ্তাহের দিবসগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ শুক্রবার। সুতরাং বৎসরের দিবসসমূহের মধ্যে জুমাতুল বিদা সর্বশ্রেষ্ঠ।

এ পুণ্যময় দিনে এমন একটি সময় আছে, যেসময় বান্দার মোনাজাত ও দোয়া আল্লাহ বিশেষভাবে কবুল করেন। তাই রমযানের শেষ জুমা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যমন্ডিত। এদিন জুমায় সারাদেশের সব জামে মসজিদে সবচেয়ে বেশি মুসল্লির সমাগম হয়। দান-খয়রাত, নানা ইবাদত-বন্দেগির মাধ্যমে ইমানদার মুসলিমগণ এদিন

অতিবাহিত করেন। রমযানের শেষ দশকে বান্দাগণ দোজখের আগুন থেকে আল্লাহর নিকট থেকে মুক্তির জন্য মোনাজাত করেন।

ঈদুল ফিত্‌র

ঈদুল ফিত্‌র মুসলমানদের প্রধান দুটি ধর্মীয় উৎসবের একটি। ঈদ ও ফিত্‌র দুটিই আরবি শব্দ। ঈদ-এর অর্থ উৎসব বা আনন্দ। ফিত্‌র-এর অর্থ বিদীর্ণ করা, উপবাস ভঙ্গাকরণ, স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাওয়া। পবিত্র রমযান মাসে সিয়াম সাধনা ও সংযম পালনের পর শাওয়াল মাসের ১লা তারিখে সিয়াম ভঙ্গ করে স্বাভাবিক কর্মজীবনে ফিরে যাওয়ার আনন্দময় দিবসটি 'ঈদুল ফিত্‌র' নামে অভিহিত। পবিত্র রমযানের নতুন চাঁদ দেখে রোযার মাস শুরু হয় এবং শাওয়াল মাসের নতুন চাঁদ দেখে রোযা ভঙ্গ করা হয়। রোযায় সুবেহ সাদিক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সারাদিন পানাহার ও দৈহিক সংসর্গ থেকে বিরত থাকতে হয়। এ একমাস মুসলমানেরা কাম, ক্রোধ, হিংসা, লোভ ইত্যাদি সকল কু-প্রবৃত্তিকে দমন করে রাখে। এ কারণে ফিত্‌র শব্দটি বিজয় অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

আজ থেকে প্রায় ১৩৮০ বছর পূর্বে এই ঈদুল ফিতর উদযাপন শুরু হয়। ইসলামের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মদিনাতে হিযরতের অব্যবহিত পরেই এই উৎসবের প্রবর্তন ঘটে। মুসলমানেরা এদিন ঈদগাহে বা মসজিদে গিয়ে বড় জামায়াতে ঈদের দুই রাকাত নামায পড়ে এবং আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করে। পদমর্যাদা কিংবা বয়স নির্বিশেষে সকলে কোলাকুলিসহ সালাম বিনিময় করে। আত্মীয়-স্বজন ও পুণ্যবানদের কবর যিয়ারত করে। ঈদের দিন সকালে সচ্ছল মুসলমানদের প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ফিতরা বা অনুদান হিসেবে দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করতে হয়।

ঈদুল ফিত্‌র বাংলাদেশে সর্ববৃহৎ ও প্রাচীন উৎসবগুলির অন্যতম। বাংলাদেশে এ দিবসটি খুবই জাঁকজমকের সঙ্গে পালিত হয়। ধর্মীয় উৎসব হলেও এই ঈদের আনন্দ সকল ধর্মের মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। সকলেই এদিন সাধ্যানুযায়ী ভালো পোশাক পরে এবং উন্নতমানের খাবার আয়োজন করে। আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকজনও এ আনন্দের অংশীদার হয়। ঈদুল ফিতরের দিন এবং তার পূর্ব ও পরের দিন মোট তিন দিন সরকারি সাধারণ ছুটি থাকে।

ঈদুল আযহা

ঈদুল আযহা মুসলমানদের প্রধান দুটি ধর্মীয় উৎসবের অন্যতম। বাংলাদেশে এটি কুরবানির ঈদ, বাকরা ঈদ নামে পরিচিত। হিজরি বর্ষের ১০ই জিলহজ এই উৎসব পালিত হয়। ঈদ ও আযহা দুটিই আরবি শব্দ। ঈদ-এর অর্থ উৎসব বা আনন্দ। আযহার অর্থ কুরবানি বা উৎসর্গ করা। হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ তা'লার আদেশ পালনের উদ্দেশ্যে প্রাণপ্রিয় জ্যেষ্ঠপুত্র হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে তাঁর (হযরত ইসমাঈলের) সম্মতিতে কুরবানি করতে উদ্যত হন। মক্কার নিকটস্থ ''মীনা'' নামক স্থানে ৩৮০০ (সৌর) বছর পূর্বে এ মহান কুরবানির উদ্যোগ নেওয়া হয়। তাঁর ঐকান্তিক নিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহ হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে তাঁর পুত্রের স্থলে একটি পশু কুরবানি করতে আদেশ দেন। আল্লাহর প্রতি অবিচল আনুগত্য ও নজিরবিহীন নিষ্ঠার এ মহান ঘটনার ধারাবাহিকতায় আজও মীনায় এবং মুসলিম জগতের সর্বত্র আত্মত্যাগের প্রতীক হিসেবে পশু কুরবানির রীতি প্রচলিত রয়েছে।

হজ পালনকালে ১০ই জিলহজ ঈদুল আযহার দিন হাজিগণ মীনা প্রান্তরে কুরবানি করেন। মুসলিম জগতের সর্বত্র সকল সক্ষম মুসলমানের জন্য কুরবানি করা ওয়াজিব। নির্ধারিত বয়সের সুস্থ-সবল উট, গরু, মহিষ, ছাগল, দুম্বা ইত্যাদি প্রাণী কুরবানি করা হয়। ঈদের নামাযের পর থেকে কুরবানির সময় আরম্ভ হয়। ১০ই জিলহজের পরবর্তী দুইদিন পর্যন্ত কুরবানি করা যায়। কুরবানি পর প্রাপ্ত গোস্তের তিন ভাগের এক ভাগ মালিক, এক ভাগ আত্মীয়-স্বজন ও বাকি এক ভাগ দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এতে দরিদ্রদের প্রতি ধনীদের দায়িত্ব পালনের একটি সুযোগ তৈরি হয় এবং একই সঙ্গে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মুসলমানদের ন্যায় বাংলাদেশের মুসলমানেরাও যথাযথ ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় ঈদুল আযহা পালন করে থাকে। এ সময় মুসলমানেরা নতুন পোশাক পরে পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ি যায় এবং কুশল বিনিময় করে। প্রত্যেক বাড়িতেই উন্নতমানের খাবারের আয়োজন করা হয়। অন্য ধর্মাবলম্বীরাও কোথাও কোথাও নিমন্ত্রিত হয়ে এ উৎসবে যোগদান করে। এ উপলক্ষ্যে তিনদিনের সরকারি ছুটি পালিত হয়।

জাতীয় শোক দিবস

জাতীয় শোক দিবস বাংলাদেশে পালিত একটি জাতীয় দিবস। প্রতি বছর **১৫ই আগস্ট** জাতীয় ও রাষ্ট্রীয়ভাবে এ দিবসটি শোকের সাথে পালন করা হয়। এ দিবসে কালো পতাকা উত্তোলন ও বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা অর্ধনিমিত রাখা হয়।

১৫ই আগস্ট, ১৯৭৫ স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের নিজ বাসায় সেনাবাহিনীর কতিপয় বিপথগামী সেনাসদস্যের হাতে সপরিবারে শাহাদাত বরণ করেন। সেদিন তিনি ছাড়াও ঘাতকের বুলেটে শহিদ হন তাঁর স্ত্রী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব। এ রাতে তাঁদের পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়স্বজনসহ শহিদ হন আরো ২৬ জন। ১৫ই আগস্ট শহিদ মুজিব পরিবারের সদস্যরা হলেন ছেলে শেখ কামাল, শেখ জামাল ও শিশু পুত্র শেখ রাসেল; পুত্রবধু সুলতানা কামাল ও রোজী জামাল; ভাই শেখ আবু নাসের, ভগ্নিপতি আব্দুর রব সেরনিয়াবাত, ভাগনে শেখ ফজলুল হক মণি ও তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী বেগম আরজু মণি। বঙ্গবন্ধুর জীবন বাঁচাতে ছুটে আসেন কর্নেল জামিলউদ্দীন, তিনিও শহিদ হন। দেশের বাইরে থাকায় বেঁচে যান জননেত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর ছোটবোন শেখ রেহানা। প্রতি বছর ১৫ই আগস্ট জাতি গভীর শোক ও শ্রদ্ধায় স্মরণ করে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের, পালিত হয় জাতীয় শোক দিবস।

জাতীয় শোক দিবসকে সামনে রেখে আগস্ট মাসের প্রথম দিন থেকেই বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক সংগঠন বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে থাকে। এছাড়াও সরকারিভাবে পালিত হয় দিবসটির বিভিন্ন কর্মসূচি। সরকারি কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে ১৫ই আগস্ট সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বেসরকারি ভবনসহ বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা এবং আলোচনা সভা। এদিনটি পালনের জন্য সরকারি ছুটি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

ভোরে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন এবং সশস্ত্র বাহিনী গার্ড অব অনার প্রদান করে থাকে।

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে সারা দেশে মসজিদগুলোয় বাদজোহর বিশেষ মোনাজাত এবং মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে সুবিধাজনক সময়ে বিশেষ প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল ও রেডিও বিশেষ অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে। জাতীয় দৈনিক ও সাময়িকীতে ক্রোড়পত্র প্রকাশ, পোস্টার মুদ্রণ ও বিতরণ এবং বঙ্গবন্ধুর ওপর প্রামাণ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শন

করে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়েও যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় শোক দিবসে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

শুভ জন্মাষ্টমী

জন্মাষ্টমী হিন্দুদের অন্যতম প্রধান উৎসব। শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন উপলক্ষ্যে এ উৎসব পালিত হয়। কৃষ্ণ হলেন হিন্দু ধর্মানুসারীদের আরাধ্য বিশিষ্ট একজন দেবতা। তিনি ভগবান বিষ্ণুর অষ্টম অবতাররূপে খ্যাত। কখনো কখনো তাঁকে সর্বোচ্চ ঈশ্বর ('পরম সত্তা') অভিধায় ভূষিত করা হয় এবং হিন্দুদের অন্যতম প্রধান ধর্মগ্রন্থ ভগবদগীতার প্রবর্তক হিসেবে মান্য করা হয়। প্রচলিত বিশ্বাসমতে, দ্বাপর যুগের সন্ধিক্ষণে রোহিনী নক্ষত্রে অষ্টমী তিথিতে কৃষ্ণের আবির্ভাব এই মর্ত্য পৃথিবীতে। তাই এ দিনটি কৃষ্ণের জন্মাষ্টমী নামে খ্যাত।

শ্রীমদ্ভগবদগীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, যখনই পৃথিবীতে অধর্মের প্রাদুর্ভাবে, দুরাচারীর অত্যাচার ও নিপীড়নে ভক্তের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে, তখন ধর্ম সংস্থাপনের জন্য কৃপা করে ভক্তের আকুল প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে ঈশ্বর অবতার রূপ নিয়ে থাকেন। তখন তিনি ষড়গুণ যথা- ঐশ্বর্য, বীর্য, তেজ, জ্ঞান, শ্রী ও বৈরাগ্যসম্পন্ন পূর্ণাবতাররূপে প্রকাশিত হন। শ্রীকৃষ্ণ আজীবন শান্তি, মানবপ্রেম ও ন্যায়ের পতাকা সমুন্নত রেখেছেন। তিনি তাঁর জীবনাচরণ এবং কর্মের মধ্য দিয়ে সত্য ও সুন্দরের আরাধনা করেছেন। মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন এবং সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালনের জন্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এ ধরাধামে অবতীর্ণ হয়ে মানুষকে সত্য সুন্দর ও ন্যায়ের পথ দেখিয়ে গেছেন।

বর্তমানে প্রতি বছর ঢাকার ঢাকেশ্বরী মন্দির থেকে শুরু করে সারা দেশব্যাপী যথাযোগ্য মর্যাদায় জন্মাষ্টমীর মিছিল বের হয় এবং শহর প্রদক্ষিণ করে পুনরায় মন্দিরে এসে শেষ হয়। এ দিন সরকারি ছুটি থাকে এবং দেশব্যাপী বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান ধর্মীয় আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিবসটি পালন করে।

দুর্গাপূজা (বিজয়া দশমী)

দুর্গাপূজা বাঙালি হিন্দুদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। তবে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অবাঙালিরাও ভিন্ন ভিন্ন নামে এ উৎসব পালন করে। দুর্গা পৌরাণিক দেবী। তিনি আদ্যাশক্তি, মহামায়া, শিবানী, ভবানী, দশভুজা, সিংহবাহনা ইত্যাদি নামে অভিহিত হন। দুর্গ বা দুর্গম নামক দৈত্যকে বধ করেন বলে তাঁর নাম হয় দুর্গা। জীবের দুর্গতি নাশ করেন বলেও তাঁকে দুর্গা বলা হয়। ব্রহ্মার বরে পুরুষের অবধ্য মহিষাসুর নামে এক দানব স্বর্গরাজ্য দখল করলে

রাজ্যহারা দেবতারা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণুর নির্দেশে সকল দেবতার তেজঃপুঞ্জ থেকে যে দেবীর জন্ম হয় তিনিই দুর্গা। দেবতাদের শক্তিতে শক্তিময়ী এবং বিভিন্ন অস্ত্রে সজ্জিতা হয়ে এ দেবী যুদ্ধে মহিষাসুরকে বধ করেন। তাই দেবীর এক নাম হয় মহিষমর্দিনী। দেবী দুর্গা দশভুজা। তাঁর দশটি ভুজ বা হাত। তিনটি চোখ রয়েছে, এজন্য তাঁকে ত্রিনয়না বলা হয়। তাঁর বাম চোখ চন্দ্র, ডান চোখ সূর্য এবং কেন্দ্রীয় বা কপালের ওপর অবস্থিত চোখ জ্ঞান বা অগ্নিকে নির্দেশ করে। তাঁর দশ হাতে দশটি অস্ত্র রয়েছে যা শক্তির প্রতীক এবং শক্তিধর প্রাণী সিংহ তাঁর বাহন।

দুর্গাপূজার প্রচলন সম্পর্কে পুরাণে লিখিত হয়েছে যে, পুরাকালে রাজ্যহারা রাজা সুরথ এবং স্বজনপ্রতারিত সমাধি বৈশ্য একদিন মেধস মুনির আশ্রমে যান। সেখানে মুনির পরামর্শে তাঁরা দেবী দুর্গার পূজা করেন। পূজায় তুষ্টা দেবীর বরে তাঁদের মনস্কামনা পূর্ণ হয়। এ পূজা বসন্তকালে হয়েছিল বলে এর এক নাম 'বাসন্তী' পূজা। কৃত্তিবাসী রামায়ণ থেকে জানা যায় যে, রামচন্দ্র রাবণবধের জন্য অকালে শরৎকালে দেবীর পূজা করেছিলেন। তখন থেকে এর নাম হয় অকালবোধন বা শারদীয়া দুর্গাপূজা। বাসন্তী পূজা হয় চৈত্রের শুক্লপক্ষে, আর শারদীয়া পূজা হয় সাধারণত আশ্বিনের কখনও বা কার্তিকের শুক্লপক্ষে। বর্তমানে শারদীয়া পূজাই সমধিক প্রচলিত। এসময় শুক্লা ষষ্ঠীতিথিতে দেবীর বোধন হয় এবং সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী (মহানবমী)-তে পূজা দিয়ে দশমীর দিন প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়। দেবী দুর্গা জগতের সকল অন্যায় বিনাশ করে বিজয়ী বেশে বিদায় নেন বলে একে বিজয়া দশমী বলে।

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় এই দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে আত্মীয়স্বজন সকলে একত্র মিলিত হয়। ঢাকার সর্বজনীন দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয় ঢাকেশ্বরী মন্দিরে। সারা দেশে কয়েক হাজার মণ্ডপে পূজানুষ্ঠান হয়। পূজা উপলক্ষ্যে গরিব-দুঃখীদের মধ্যে খাদ্য ও বস্ত্র বিতরণ করা হয়। দশমীর দিন সরকারি ছুটি থাকে। দশমীর দিন সকাল থেকে চলে বিসর্জনের আয়োজন। মিছিল সহকারে প্রতিমা নিয়ে বিকেল থেকে শুরু হয় নিকটস্থ নদী-খাল-বিল কিংবা পুকুরে বিসর্জনের পালা। এভাবে বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হয় পাঁচদিনব্যাপী দুর্গোৎসব।

ঈদ-ই-মিলাদুন্নবি (সা.)

ঈদ-ই-মিলাদুন্নবি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্মদিনের উৎসব। আরবি মাওলিদ শব্দ থেকে মিলাদ শব্দটি এসেছে। এর অর্থ জন্মকাল, জন্মস্থান, জন্মদিন, জন্মোৎসব। ঈদ-ই-মিলাদুন্নবি-র অর্থ নবির জন্মদিনের আনন্দোৎসব। হিজরি সনের ১২ই রবিউল আওয়াল তারিখে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্মদিন উপলক্ষ্যে এই উৎসব পালিত হয়। দিনটি সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে আগস্ট,

রবিউল আওয়াল মাসের ১২ তারিখ সোমবার সূর্যোদয়ের ঠিক পূর্বমুহূর্তে সুবেহ সাদিকের সময় তিনি আরবের মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতা বিবি আমিনা এবং পিতা আবদুল্লাহ।

আরবের ইতিহাসের এক অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে তাঁর জন্ম। তিনি এক মহান সংস্কারক হিসেবে সকল কুসংস্কার ও অন্যায় দূর করে আলোকময় ইসলাম ধর্ম প্রবর্তন করেন। সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তিনি সমগ্র পৃথিবীর জন্য রহমত-স্বরূপ প্রেরিত হয়েছিলেন। তেষট্টি বছরের এক মহান আদর্শিক জীবন অতিবাহিত করে ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দের ৮ই জুন, ১১ হিজরি সনের রবিউল আওয়াল মাসের ১২ তারিখ একই দিনে তিনি ইন্তেকাল করেন।

জন্ম ও মৃত্যু একই দিনে হলেও মূলত জন্মদিনের উৎসব হিসেবেই পালিত হয় ঈদ-ই-মিলাদুন্নবি। এদিন বিশ্বের মুসলিম সম্প্রদায় হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনাদর্শ আলোচনা ও নানা ইবাদত-বন্দেগিতে মশগুল থাকেন। বাংলাদেশেও দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। দিনটিতে সরকারি ছুটি পালিত হয়।

বিজয় দিবস

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল বিজয়ের দিন ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১। ২২শে জানুয়ারি, ১৯৭২ তারিখে প্রকাশিত এক প্রজ্ঞাপনে এই দিনটিকে বাংলাদেশের বিজয় দিবস হিসেবে উদযাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং সরকারিভাবে এ দিনটিতে ছুটি ঘোষণা করা হয়। ৯ মাস যুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে (পূর্বের রেসকোর্স ময়দানে) হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর প্রায় ৯১,৬৩৪ সদস্য বাংলাদেশ ও ভারতের সমন্বয়ে গঠিত যৌথবাহিনীর কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করে। এর ফলে পৃথিবীর বুকে বাংলাদেশ নামে একটি নতুন স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে।

এ উপলক্ষ্যে প্রতি বছর বাংলাদেশে দিবসটি যথাযথ ভাবগাম্ভীর্য এবং বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে পালিত হয়। ১৬ই ডিসেম্বর ভোরে ৩১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে দিবসের সূচনা ঘটে। জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে অনুষ্ঠিত সম্মিলিত সামরিক কুচকাওয়াজে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ নৌবাহিনী এবং বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর সদস্যরা যোগ দেন। কুচকাওয়াজের অংশ হিসেবে সালাম গ্রহণ করেন দেশের মাননীয় রাষ্ট্রপতি কিংবা প্রধানমন্ত্রী। এই কুচকাওয়াজ দেখার জন্য প্রচুর সংখ্যক মানুষ জড়ো হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যাঁরা শহিদ হয়েছেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের অংশ হিসেবে ঢাকার অদূরে সাভারে অবস্থিত জাতীয় স্মৃতিসৌধে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেতা-কর্মী, বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনসহ সর্বস্তরের মানুষ পুষ্পস্তবক অর্পণ করে থাকেন।

যিশু খ্রিষ্টের জন্মদিন (বড়দিন)

ক্রিসমাস বা বড়দিন খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। প্রতি বছর রোমান ক্যাথলিক ও প্রটেস্টান্ট চার্চের অনুসারীরা যিশুখ্রিষ্টের জন্মদিন উপলক্ষ্যে এ উৎসব উদযাপন করে। ২০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে এ উৎসব পালন শুরু হয়। ৩৫৪ খ্রিষ্টাব্দে দিনটিকে যিশুর জন্ম দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এ ঘোষণা ৪৪০ খ্রিষ্টাব্দে পোপ স্বীকার করেন। মূলত পৌত্তলিক রোমানদের উৎসবের বিপরীতে ক্রিসমাস বা বড়দিন পালন শুরু হয়। ক্রিসমাস যদিও ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত, কিন্তু বর্তমানে এটি একটি ধর্মনিরপেক্ষ উৎসবে পরিণত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে খ্রিষ্টানগণ আনন্দ-উৎসব করে এবং একে অপরকে শুভেচ্ছা কার্ড ও উপহার পাঠায়। এসব উপহার যিনি বহন করে নিয়ে আসেন তাঁকে নানা নামে ডাকা হয়, যেমন Father Christmas, Santa Claus, Saint Nicholas ইত্যাদি।

ক্রিসমাস কার্ডের প্রচলন শুরু হয় উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। ক্রিসমাস বৃক্ষ- সাধারণত মোচাকৃতির পাইন বা ফার বৃক্ষ- ছোট ছোট বৈদ্যুতিক বাল্ব এবং উপহার সামগ্রী দিয়ে সাজানো হয়। কখনও কখনও গাছের ওপরে দেওয়া হয় একজন দেবদূত ও একটি তারার প্রতিকৃতি। ক্যাথলিকদের ক্রিসমাস পালনের অংশ হিসেবে তারা যিশুর শিশুকালের দৃশ্য দেখায়, যেমন গোয়ালঘরে পশুকে খড় খাওয়ানোর গামলায় শিশু যিশু এবং পাশে তাঁর মা মেরী ও যোশেফ দণ্ডায়মান।

বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রীতিতে এ উৎসব পালিত হয়। বাংলাদেশে ক্রিসমাস শুরু হয় ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে বিভিন্ন চার্চে ক্রিসমাস ক্যারল গানের মধ্য দিয়ে। বাড়িতে বাড়িতেও ক্রিসমাস ক্যারল গাওয়া হয়ে এবং এর মাধ্যমে যে অর্থ সংগৃহীত হয় তা দিয়ে ভোজ এবং আনন্দ-উৎসব করা হয়। ক্রিসমাসের উৎসব জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত চলে। ক্রিসমাসের আগের সন্ধ্যায় বা তারও আগে থেকে উপহার বিনিময় চলে। ক্রিসমাসের আগের দিন মধ্যরাত থেকে পরদিন সকাল পর্যন্ত গির্জায় গির্জায় বিশেষ উপাসনা করা হয়। নিমন্ত্রিত আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের জন্য বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা থাকে। আমাদের দেশে দিনটিতে সরকারি সাধারণ ছুটি পালন করা হয়।

নির্বাহী আদেশে সরকারি ছুটি

বাংলা নববর্ষ
শবে বরাত
শবে কদর
পবিত্র আশুরা (১০ই মুহররম)

বাংলা নববর্ষ

পহেলা বৈশাখ বাংলা সনের প্রথম দিন। এ দিনটি বাংলাদেশে নববর্ষ হিসেবে পালিত হয়। এটি বাঙালির একটি সর্বজনীন **লোকউৎসব**। এদিন আনন্দঘন পরিবেশে বরণ করে নেওয়া হয় নতুন বছরকে। কল্যাণ ও নতুন জীবনের প্রতীক হলো নববর্ষ। অতীতের ভুলত্রুটি ও ব্যর্থতার গ্লানি ভুলে নতুন করে সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনায় উদযাপিত হয় নববর্ষ। এদিন সরকারি বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে।

বাংলা নববর্ষ পালনের সূচনা হয় মূলত আকবরের সময় থেকেই। সে সময় বাংলার কৃষকেরা চৈত্রমাসের শেষদিন পর্যন্ত জমিদার, তালুকদার এবং অন্যান্য ভূ-স্বামীর খাজনা পরিশোধ করত। পরদিন নববর্ষে ভূস্বামীরা তাদের মিষ্টিমুখ করাতেন। এ উপলক্ষ্যে তখন মেলা এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো। ক্রমান্বয়ে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে পহেলা বৈশাখ আনন্দময় ও উৎসবমুখী হয়ে ওঠে এবং বাংলা নববর্ষ শুভদিন হিসেবে পালিত হতে থাকে। অতীতে বাংলা নববর্ষের মূল উৎসব ছিল হালখাতা। এটি পুরোপুরিই একটি অর্থনৈতিক ব্যাপার। গ্রামে-গঞ্জে-নগরে ব্যবসায়ীরা নববর্ষের প্রারম্ভে তাঁদের পুরানো হিসাব-নিকাশ সম্পন্ন করে হিসাবের নতুন খাতা খুলতেন।

নববর্ষের উৎসব বাংলার গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, ফলে গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে দিনটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। নববর্ষে ঘরে ঘরে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং প্রতিবেশীদের আগমন ঘটে। মিষ্টি-পিঠা-পায়েসসহ নানা রকম লোকজ খাবার তৈরির ধুম পড়ে যায়। একে অপরের সঙ্গে নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময় চলে। প্রিয়জনকে উপহার দেওয়ার মাধ্যমেও নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময় হয়, যা শহরাঞ্চলেও এখন বহুল প্রচলিত। নববর্ষকে উৎসবমুখর করে তোলে বৈশাখী মেলা। এটি মূলত সর্বজনীন লোকজ মেলা। এ মেলা অত্যন্ত আনন্দঘন হয়ে থাকে। স্থানীয় কৃষিজাত দ্রব্য, কারুপণ্য, লোকশিল্পজাত পণ্য, কুটির শিল্পজাত সামগ্রী, **সর্বপ্রকার** হস্তশিল্পজাত ও মৃৎশিল্পজাত সামগ্রী এই মেলায় পাওয়া যায়। এছাড়া শিশু-কিশোরদের খেলনা, মহিলাদের সাজ-সজ্জার সামগ্রী এবং বিভিন্ন লোকজ খাদ্যদ্রব্য যেমন: চিড়া, মুড়ি, খৈ, বাতাসা, বিভিন্ন প্রকার মিষ্টি প্রভৃতির বৈচিত্র্যময় সমারোহ থাকে মেলায়। মেলায় বিনোদনেরও ব্যবস্থা থাকে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকগায়ক ও লোকনর্তকদের উপস্থিতি থাকে। তাঁরা যাত্রা, পালাগান, কবিগান, জারিগান, গম্ভীরা গান, গাজীর গান, আলকাপ গানসহ বিভিন্ন ধরনের **লোকসঙ্গীত**, বাউল-মারফতি-মুর্শিদি-ভাটিয়ালি ইত্যাদি আঞ্চলিক গান পরিবেশন করেন।

বর্ষবরণের চমকপ্রদ ও জমজমাট আয়োজন ঘটে রাজধানী ঢাকায়। এখানে বৈশাখী উৎসবের অনুষ্ঠানমালা এক মিলন মেলার সৃষ্টি করে। নববর্ষের প্রথম প্রভাতে রমনা উদ্যান ও এর চারপাশের এলাকায় উচ্ছল জনস্রোতে সৃষ্টি

হয় জাতীয় বন্ধন। ছায়ানটের উদ্যোগে জনাকীর্ণ রমনার বটমূলে রবীন্দ্রনাথের আগমনী গান ‘এসো হে বৈশাখ এসো এসো’-এর মাধ্যমে নতুন বর্ষকে বরণ করা হয়। ১৩৭২ বঙ্গাব্দে (১৯৬৫) ছায়ানট প্রথম এ উৎসব শুরু করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের বকুলতলার প্রভাতী অনুষ্ঠানেও নববর্ষকে সম্ভাষণ জানানো হয়। এখানকার চারুশিল্পীদের বর্ণাঢ্য মঙ্গল শোভাযাত্রা নববর্ষের আবাহনকে করে তোলে নয়নমনোহর এবং গভীর আবেদনময়।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে সংস্কৃতি অঙ্গনে পহেলা বৈশাখ উদযাপন একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উৎসবে পরিণত হয়। বর্তমানে বাংলা নববর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ সর্বজনীন এক জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে।

শবে বরাত

শবে বরাত মুসলমানদের জন্য একটি বরকতময় রজনী। হিজরি সনের শাবান মাসের পঞ্চদশ রাত মুসলমানেরা ইবাদত-বন্দেগির মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত করে। ‘শবে বরাত’ একটি ফারসি যৌগিক শব্দ; ‘শব’ অর্থ রাত্রি এবং ‘বরাত’ অর্থ মুক্তি, যার সম্মিলিত অর্থ দাঁড়ায় মুক্তি পাওয়ার রাত্রি। একে আরবিতে ‘লায়লাতুল বরাত’ বলা হয়, যার অর্থ মুক্তির রাত্রি। উপমহাদেশে শবে বরাত প্রধানত সৌভাগ্য রজনী হিসেবে পালিত হয়।

শবে বরাত উদযাপনের বিশেষ তাৎপর্য আছে। মুসলমানদের ধারণা, এ রাতে পরের বছরের ভাগ্য লিপিবদ্ধ হয়; সারা রাত জেগে ইবাদত-বন্দেগি ও আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে মানুষের গুনাহ মাফ হওয়ার আশা করা যায়।

শবে বরাতের দিন হালুয়া-রুটি ইত্যাদি খাবার তৈরি করে প্রতিবেশী ও গরিবদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। মুসল্লিগণ মসজিদে গিয়ে সালাত ও জিকরে রত হন। দিনে সিয়াম ও রাতে নফল নামায আদায় করা হয়। আল-কুরআনে শবে বরাতের উল্লেখ নেই। তবে সূরায়ে দুখানে লায়লা মুবারাকার উল্লেখ আছে। কোনো কোনো তাফসিরকার লায়লা মুবারাকা দ্বারা শবে বরাতকে বোঝানো হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। হাদিসে উল্লেখ আছে যে, মহানবি (সা.) শাবান মাসের পনের তারিখ রাতে মদিনার জান্নাতুল বাকী গোরস্থানে কবর জিয়ারত করেছিলেন এবং উম্মুল মুমিনিন আয়েশা (রা)-কে এ রাতে ইবাদত করতে বলেছিলেন। শাবানের পনেরো তারিখে নফল রোজা রাখার বিধান আছে। এদিন মুসলিমদের ধর্মীয় পর্বের ঐচ্ছিক ছুটি পালিত হয়।

শবে কদর

শবে কদর ইসলাম ধর্মমতে বছরের সর্বাধিক মহিমান্বিত ও বরকতময় রাত। কুরআন ও হাদিসে এর নাম 'লায়লাতুল কাদ্র'; বাংলাদেশে শবে কদর হিসেবেই পরিচিত। শব ফারসি শব্দ, অর্থ রাত, কদর আরবি, অর্থ মর্যাদা, ক্ষমতা। শবে কদর অর্থ 'মর্যাদার রাত'। এই পবিত্র রাতে হেরা গুহায় মহানবি (সা.)-এর নিকট আল-কুরআনের প্রথম সূরার (সূরা 'আলাক) পাঁচটি আয়াত নাযিল হয়।

শবে কদর সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে: 'নিশ্চয়ই আমি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি মহিমান্বিত রজনীতে; আর মহিমান্বিত রজনী সম্বন্ধে তুমি কী জান? মহিমান্বিত রজনী সহস্র মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; সেই রাত্রিতে ফিরিশতাগণ ও রূহ্ অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক কাজে তাহাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে; শান্তি, শান্তি, সেই রজনীর উষার আবির্ভাব পর্যন্ত' (৯৭: ১-৫)। এই মহিমান্বিত রাতটি মুসলমানদের জন্য আল্লাহর এক বিরাট রহমত, কারণ এই একটিমাত্র রাতে ইবাদত করে তারা হাজার মাসের ইবাদত অপেক্ষা অধিক সওয়াব পেতে পারে।

শবে কদরের তারিখ সম্পর্কে মতভেদ আছে। কুরআনে রমযান মাসের উল্লেখ আছে, তবে কোনো নির্দিষ্ট তারিখের কথা নেই। হাদিসে এর তারিখ সম্পর্কে মহানবি (সা.)-এর বিভিন্ন উক্তি আছে: 'রমযানের শেষ দশকের মধ্যে একটি বে-জোড় রাত, শেষ সাত দিনের মধ্যে একটি বে-জোড় রাত, ২১তম, ২৩তম ও ২৫তম রাতের বা ২৫তম, ২৭তম ও ২৯তম রাতের মধ্যে একটি।' মহানবি (সা.) মুমিনগণকে এই রাতে অত্যধিক ইবাদত করার আদেশ দিয়েছেন। অধিকাংশ আলিম মনে করেন যে, রমযানের ২৭তম রাতই শবে কদর। বাংলাদেশেও এই মত প্রচলিত। শবে কদরের রাত জেগে কেউ ইবাদত করলে তার অতীতের সমুদয় পাপ মার্জনা করা হয়।

বাংলাদেশে গভীর ধর্মীয় অনুভূতির সঙ্গে শবে কদর উদযাপিত হয়। ইশার নামাযের সময় মুসল্লিগণ মসজিদে একত্র হন এবং অনেকে শেষরাত পর্যন্ত নফল ইবাদত করেন। শবে কদরের পরদিন (২৭তম রমজান) বাংলাদেশে সরকারি ছুটি থাকে।

পবিত্র আশুরা (১০ই মুহররম)

পবিত্র আশুরা বিশ্ব মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য ঐতিহাসিক ঘটনাবহুল দিবস। 'আশুরা' আরবি শব্দ, অর্থ 'মুহররম মাসের দশ তারিখ'। কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার আগে এ দিনটি আনন্দোৎসবের মধ্য দিয়ে পালিত হতো। কারণ এদিন হযরত মূসা (আ.) ও তাঁর জাতি ফেরাউনদের অত্যাচার থেকে মুক্তিলাভ করে। হযরত নূহ্ (আ.)-এর যুগে

এক ভয়ঙ্কর প্লাবনে সবকিছু ডুবে গেলে তিনি মোমিনদের নিয়ে নৌকায় ওঠেন এবং প্লাবনশেষে এ আশুরার দিনেই স্থলভাগে অবতরণ করেন।

ইসলামের ইতিহাসে দিনটি বিভিন্ন কারণে গুরুত্বপূর্ণ। বলা হয়, এই দিনে আসমান ও জমিন সৃষ্টি করা হয়েছিল, সৃষ্টি করা হয়েছিল হযরত আদম (আ.)-কে। এই দিন আল্লাহ বিভিন্ন নবিকে ক্ষমা ও বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন। আশুরার দিনেই নবি মুসা (আ.)-এর শত্রু ফেরাউনকে নীল নদে ডুবিয়ে দেওয়া হয়, দাউদ (আ.)-এর তওবা কবুল হয়েছিল, আইয়ুব (আ.) দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে সুস্থতা লাভ করেছিলেন। এদিন মহান আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসা (আ.)-কে ঊর্ধ্বাকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন। আবার প্রচলিত আছে যে, এই তারিখেই কেয়ামত সংঘটিত হবে; যদিও এই বিষয়ে মতভিন্নতা রয়েছে।

বর্তমানে আশুরার গুরুত্ব কারবালায় ইমাম হোসেন (রা.)-এর শাহাদাত বরণের কারণে। হিজরি ৬১ সনের ১০ই মুহররম (১০ই অক্টোবর, ৬৮০ খ্রি.) তারিখে এজিদ বিন মুয়াবিয়ার অনুগত সৈন্যদের সঙ্গে এক অসম যুদ্ধে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দৌহিত্র ইমাম হোসেন (রা.) নির্মমভাবে শহিদ হয়েছিলেন। এই যুদ্ধে প্রায় ৭২ জন শাহাদাত বরণ করেন। এ দিনটিকে শিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা সর্বজনীন শোকদিবস এবং সমগ্র মুহররম মাসকে চরম আত্মত্যাগের প্রতীক হিসেবে মনে করে। বাংলাদেশে প্রধানত শিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা আশুরা উদযাপন করে। ঢাকার আহসান মঞ্জিল এর প্রধান কেন্দ্র। এখান থেকে তাজিয়া সহকারে শোভাযাত্রা বের করা হয় এবং শোভাযাত্রার সময় ‘হায় হোসেন! হায় হোসেন!’ ধ্বনি উচ্চারণ ও বুক চাপড়িয়ে শোক প্রকাশ করা হয়। তবে ধর্মপ্রাণ মুসলিম সম্প্রদায় এ উপলক্ষ্যে দুই দিন রোজা রাখেন ও নানা ইবাদত-বন্দেগি করে দিনটিকে উদযাপন করেন। দিনটি মুসলিম ধর্মসম্প্রদায়ের জন্য ঐচ্ছিক ছুটি হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

ঐচ্ছিক ছুটি (মুসলিম পর্ব)

শবে মিরাজ
হিজরি নববর্ষ
আখেরি চাহার শোম্বা
ফাতেহা-ই-ইয়াজদহম

শবে মেরাজ

শবে মেরাজ বা লাইলাতুল মেরাজ ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের এক পবিত্র রাত্রি। এই রাতে হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর সহায়তায় অলৌকিক উপায়ে ঊর্ধ্বাকাশে ভ্রমণ করেন এবং আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করেন। মুসলমানগণ ইবাদত-বন্দেগির মাধ্যমে এই রাতটি উদযাপন করেন। ইসলামে মেরাজের বিশেষ গুরুত্ব আছে, কারণ এই রাতেই আল্লাহর পক্ষ থেকে মুসলমানদের জন্য দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করা হয়।

ইসলামের ইতিহাসে বর্ণিত আছে, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির একাদশ বৎসরের (৬২০ খ্রিষ্টাব্দ) রজব মাসের ২৬ তারিখ দিবাগত রাতে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রথমে কাবা শরিফ থেকে জেরুজালেমের মসজিদুল আকসায় গমন করে পূর্ববর্তী নবিগণের সান্নিধ্য পান এবং সেখানে তিনি নবিদের জামায়াতে ইমামতি করেন। পরে তিনি বোরাক নামক বিশেষ বাহনে করে আল্লাহর আরশে (ঊর্ধ্বাকাশে) গমন করেন। আরশের সিদরাতুল মুনতাহায় তিনি আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করেন। এসময় আল্লাহ মুসলমানদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করেন। এই সফরে ফেরেশতা জিবরাইল (আ.) মহানবির সফরসঙ্গী ছিলেন। এই সফরে মহানবি (সা.) আল্লাহর পবিত্র সাক্ষাৎ লাভের পাশাপাশি পূর্ববর্তী নবিগণের সান্নিধ্য লাভ করেন এবং বেহেশত ও দোজখে পুণ্যবান ও পাপীদের অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করেন। মক্কার কাফেরদের সীমাহীন অত্যাচার ও তায়েফবাসীর দুর্ব্যবহারে মর্মাহত নবিকে আল্লাহ তাঁর দিদার লাভে ধন্য করলেন। এতে মহানবি (সা.) দ্বীন প্রচারে নতুন প্রেরণায় উজ্জীবিত হলেন। বাংলাদেশের মুসলমানদের জন্য ২৭শে রজব তারিখ শবে মেরাজের ঐচ্ছিক ছুটি হিসেবে পালিত হয়।

হিজরি নববর্ষ

হিজরি নববর্ষ মুহররম মাসের প্রথম দিনে হিজরি বর্ষবরণ উৎসব। ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা এই বর্ষগণনা পদ্ধতি অনুসরণ করে। প্রশাসনিক ও ধর্মীয় কার্যসম্পাদনের জন্য নিজস্ব একটি অব্দের প্রয়োজন অনুভূত হলে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা.) হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর হিযরতের ঐতিহাসিক ঘটনাকে স্মারক ধরে চান্দ্র মাসভিত্তিক হিজরি নববর্ষের গোড়াপত্তন করেন।

ইসলামের প্রথম যুগে মক্কার কাফিরেরা মুসলমান ও মুসলমানদের নবি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে সামাজিকভাবে বয়কট করাসহ নানা ধরনের নির্যাতন-নিপীড়ন করে ইসলামের প্রচার রুদ্ধ করে দিতে চেয়েছিল। এতেও ইসলামের প্রচার রুখতে না পেরে তারা এক পর্যায়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মহান

আল্লাহ তায়ালা তাদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দিয়ে মহানবি (সা.)-কে মদিনায় হিযরত করতে নির্দেশ দেন। সাহাবাদের হিযরতের দুই মাস পর হযরত মুহাম্মদ (সা.) ২৭শে সফর বৃহস্পতিবার রওনা দেন। তিন দিন গোপন থাকার পর সোমবার ১লা রবিউল আওয়াল আবার রওনা দেন। সোমবার ১২ই রবিউল আওয়ালে তিনি কুবায় পৌঁছেন। ১৪ দিন থাকার পর মসজিদে কুবা প্রতিষ্ঠা করে তিনি মদিনায় পৌঁছেন। এই হিযরতকে কেন্দ্র করেই হযরত ওমর (রা.)-এর আমলে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মৃত্যুর সাত বছর পর ১৭ হিজরিতে হিজরি সনের কার্যক্রম চালু হয়েছে। হিযরতের ঘটনা রবিউল আওয়াল মাসে সংঘটিত হলেও মুহররমকে হিজরি সনের প্রথম মাস ধরা হয়। কারণ তৎকালীন আরবে বছরের প্রথম মাস হিসেবে মুহররম মাস চালু ছিল। জনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি যাতে বিঘ্নিত না হয়, সেজন্য এটিকে পরির্বতন করা হয়নি।

সারা বিশ্বের মুসলমানগণ তাদের ইবাদত-বন্দেগিতে এই হিজরি সনকেই অনুসরণ করে। প্রতি বছর ১লা মুহররম তারা যথাযোগ্য ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে উদযাপন করে। বাংলাদেশে এদিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে ছুটি পালিত হয়।

আখেরি চাহার শোম্বা

আখেরি চাহার শোম্বা মহানবি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনেতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার স্মরণে পালিত ইসলামি দিবস। হিজরি বছরের সফর মাসের শেষ বুধবার এ দিবস পালিত হয়। আরবি ও ফারসি উভয় ভাষায়ই ‘আখের’ শব্দের অর্থ ‘শেষ’, আর ফারসিতে ‘চাহার শোম্বে’ অর্থ ‘চতুর্থ বুধবার’। মহানবি (সা.) তাঁর জীবনের শেষ পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে এদিন কিছুটা উপশম বোধ করে গোসল করেন এবং পথ্য গ্রহণ করেন। মদিনাবাসীরা মহানবি (সা.)-এর সুস্থতার সংবাদ পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে তাঁকে একনজর দেখে গেলেন। সকলে তাঁদের সাধ্যমত দান করলেন, শুকরিয়া নামায আদায় করলেন। এ কারণে এ দিনকে একটি শুভদিন হিসেবে গণ্য করা হয় এবং মুসলমনেরা এ দিবস উদযাপন করেন। উল্লেখ্য যে, মহানবি (সা.) এর পরবর্তী রবিউল আওয়াল মাসে ইন্তেকাল করেন।

ইরান ও উপমহাদেশের মুসলমানগণ যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালন করেন। দিল্লির মুঘল বাদশাহগণও যথেষ্ট মর্যাদার সঙ্গে দিবসটি পালন করতেন। বাংলাদেশে এদিন ঐচ্ছিক ছুটি থাকে এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ থাকে। এদিন মুসলমানগণ নফল নামায পড়েন ও দোয়া-জিকির করেন। কেউ কেউ দরিদ্রদের মধ্যে খাদ্য ও বস্ত্র বিতরণ করেন।

ফাতেহা-ই-ইয়াজদহম

ফাতেহা-ই-ইয়াজদহম ইসলামের মহামনীষী হযরত বড়পির আবদুল কাদির জিলানি (র.)-এর স্মরণদিবস হিসেবে পালিত হয়। 'ইয়াজদহম' ফারসি শব্দ, এর অর্থ '১১ তারিখ'। হিজরি সনের রবিউস সানি মাসের ১১ তারিখে গাওছুল আজম বড়পির হযরত শেখ মুহিয়ুদ্দীন আব্দুল কাদির জিলানি (র.)-এর ওফাত দিবসে যে ফাতিহা অনুষ্ঠান পালিত হয়, তারই নাম ফাতেহা-ই-ইয়াজদহম। এই মহামনীষী ৪৭০ হিজরি পারস্যের জিলান এলাকার নীফ বা নায়ফ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওফাতের প্রায় ৫০০ বছর পরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ইসলামের বিশুদ্ধতা রক্ষায় ও ইসলাম প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তিনি বাগদাদের মহান পির হযরত আবু সাঈদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন মাখরুমি (র.)-এর নিকট মারেফাতের জ্ঞান শিক্ষা করেন এবং মাখরুমি (র.)-এর খেলাফত বা প্রতিনিধিত্ব প্রাপ্ত হন। তিনি সুফি মতাদর্শের কাদেরিয়া তরিকার প্রতিষ্ঠাতা। ৫৬১ হিজরির ১১ই রবিউস সানিতে ইরাকের বাগদাদ নগরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

এ অনুষ্ঠানের প্রচলন ইরান, মধ্য এশিয়া ও ভারতীয় উপমহাদেশেই সর্বাধিক। বাংলাদেশেও এ দিবসটি যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে পালিত হয়। দেশব্যাপী মসজিদ, মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন স্থানে পবিত্র কুরআন মজিদ খতম, দরূদ পাঠ, যিকির-আযকার, গাওছুল আজমের জীবনী আলোচনা ইত্যাদি নানারকম কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে দিনটি ঐচ্ছিক ছুটি হিসেবে পালিত হয়।

ঐচ্ছিক ছুটি (হিন্দু পর্ব)

শ্রী শ্রী সরস্বতী পূজা
শ্রী শ্রী শিবরাত্রি ব্রত
শুভ দোলযাত্রা
শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের আবির্ভাব
চৈত্রসংক্রান্তি
শুভ মহালয়া
শ্রী শ্রী লক্ষ্মীপূজা
শ্রী শ্রী শ্যামাপূজা

শ্রী শ্রী সরস্বতী পূজা

সরস্বতী হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিদ্যা ও শিল্পকলার দেবী। মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে দেবী সরস্বতীর পূজা করা হয়। হিন্দুশাস্ত্রে তিনি সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার স্ত্রী বলে কথিত। বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কারণে সরস্বতী বাগদেবী, বিরজা, সারদা, ব্রাহ্মী, শতরূপা, মহাশ্বেতা প্রভৃতি নামেও পরিচিত। তাঁর বর্ণ বরফের মতো সাদা, পরনে সাদা শাড়ি, গলায় সাদা পুঁতির মালা এবং হাতে থাকে কচ্ছপি নামের একটি বীণা। সরস্বতীর বর্ণনায় সাদা বর্ণের প্রাধান্য দেখা যায়, যা তাঁর শুদ্ধতার প্রতীক এবং স্বভাবে সাত্ত্বিক গুণের পরিচায়ক।

ভক্তগণ নিজেদের মনের অজ্ঞতা দূর করা এবং জ্ঞান বিকাশের জন্য বিদ্যাদেবী সরস্বতীর পূজা করেন। এর মধ্য দিয়ে জ্ঞান আহরণের আগ্রহ বেড়ে যায়। স্কুল-কলেজের হিন্দুধর্মাবলম্বী ছাত্রছাত্রীরা এ দিনটি গভীর ভক্তিভরে উদযাপন করে থাকে। পূজার সময় পবিত্র গ্রন্থ, পাঠ্যপুস্তক এবং ছাত্রছাত্রীদের কলম-পেন্সিল দেবীর আশীর্বাদ লাভের আশায় পূজাবেদীর ওপর রাখা হয়। এ উপলক্ষ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে।

শ্রী শ্রী শিবরাত্রি ব্রত

শ্রী শ্রী শিবরাত্রি ব্রত হচ্ছে হিন্দু শৈব সম্প্রদায়ের নিকট একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠান। এই মহাশিবরাত্রি ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্দশী তিথিতে পালিত হয়। মহাশিবরাত্রি হলো হিন্দুধর্মের সর্বোচ্চ আরাধ্য দেবাদিদেব মহাদেব ‘শিবের মহারাত্রি’। অন্ধকার আর অজ্ঞতা মোচন করার আকাঙ্ক্ষায় এই ব্রত পালিত হয়।

হিন্দু মহাপুরাণ তথা শিবমহাপুরাণ অনুসারে এইরাত্রেই শিব সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের মহাতাণ্ডব নৃত্য করেছিলেন। আবার এইরাত্রেই শিব ও পার্বতীর বিবাহ হয়েছিল । এর নিগূঢ় অর্থ হল শিব ও শক্তি তথা পুরুষ ও আদিশক্তি বা পরাপ্রকৃতির মিলন। এই মহাশিবরাত্রিতে শিব তার প্রতীক লিঙ্গ তথা শিবলিঙ্গরূপে প্রকাশিত হয়ে জীবের পাপনাশ ও মুক্তির পথ দেখিয়েছিলেন।

সব ব্রতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল এই মহাশিবরাত্রি। ব্রতের আগের দিন ভক্তগণ নিরামিষ আহার করে। ব্রতের দিন তারা উপবাসী থাকে। তারপর রাত্রিবেলা চার প্রহরে শিবলিঙ্গকে দুধ, দই, ঘৃত, মধু ও গঙ্গাজল দিয়ে স্নান করানো হয়। বাংলাদেশের সমস্ত শিবমন্দিরে এই পূজা চলে, তান্ত্রিকেরাও এইদিন সিদ্ধিলাভের জন্য বিশেষ সাধনা করে।

শুভ দোলযাত্রা

দোলযাত্রা হিন্দুদের একটি ধর্মীয় উৎসব। এটি শুধু 'দোল' নামেও পরিচিত। উত্তর ভারতে এর নাম হোলি, কোথাও কোথাও একে হোরি-ও বলা হয়। ফাল্গুন মাসের শুক্লা চতুর্দশীতে 'বুড়ির ঘর' বা মেড়া পুড়িয়ে পরের দিন রাধাকৃষ্ণকে পূজা করা হয় এবং তাঁদের মূর্তি দোলায় রেখে আবির কুঙ্কুমে রাঙানো হয়। তারপরে একে অন্যকে আবির মাখিয়ে ধর্মীয় উৎসবকে আনন্দ উৎসবে পরিণত করা হয়। অঞ্চল বিশেষে এর পরের দিন রং বা হোলি খেলা হয়। একে অন্যের গায়ে রং ছিটিয়ে আনন্দ করা হয়। রাধাকৃষ্ণ ও গোপগোপীরা এরকম হোলি খেলেছিলেন। দোল উপলক্ষ্যে হোলি খেলা সে ঐতিহ্যের অনুসরণ।

রাধাকৃষ্ণের প্রতিমাসহ মন্দির থেকে শোভাযাত্রা বের করা হয়। এজন্য উৎসবটিকে বলা হয় দোলযাত্রা। দোলযাত্রা উপলক্ষ্যে একজনকে 'সঙ' বা হোলির রাজা সাজানো হয়। তারপর তাকে নিয়ে দল বেঁধে বাড়ি বাড়ি ঘোরা হয়। রাজা যাকে পায় তার কাছ থেকে খাজনা আদায় করে এবং পরে তা দিয়ে আনন্দ করা হয়। হোলির সময় রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক গান গাওয়া হয়। এর বিশেষ সুর ও রীতির জন্য এ গানগুলোকে বলা হয় হোলির গান।

বাংলাদেশে ঢাকাসহ বিভিন্ন অঞ্চলে এ উৎসব পালিত হয়। দোলযাত্রার মধ্য দিয়ে সামাজিক মিলন, সংহতি ও সৌহার্দ্য প্রকাশ পায়। এদিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হিন্দু ধর্মীয় পার্বণ পালনের জন্য ছুটি থাকে।

শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের আবির্ভাব

হরিচাঁদ ঠাকুর হিন্দুধর্মীয় সাধক ও মতুয়া সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক গুরু। ১২১৮ বঙ্গাব্দের (১৮১১ খ্রি.) ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় ত্রয়োদশী তিথিতে গোপালগঞ্জ (বৃহত্তর ফরিদপুর) জেলার কাশিয়ানী উপজেলার ওড়াকান্দি গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মদিনে এই আবির্ভাব উৎসব পালিত হয়।

তাঁর পিতা যশোমন্ত ঠাকুর ছিলেন একজন মৈথিলি ব্রাহ্মণ এবং নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব। হরিচাঁদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল খুবই সামান্য। পাঠশালা অতিক্রম করে তিনি কয়েক মাস মাত্র স্কুলে গিয়েছিলেন। পরে স্কুলের গণ্ডিবদ্ধ জীবন ভাল না লাগায় স্কুল ত্যাগ করে তিনি মিশে যান সাধারণ মানুষের সঙ্গে। প্রকৃতির আকর্ষণে তিনি রাখাল বালকদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ান গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। তখন থেকেই তাঁর মধ্যে এক স্বতন্ত্র ভাবের প্রকাশ ঘটে। দৈহিক সৌন্দর্য, স্বভাব-সারল্য, সঙ্গীতপ্রিয়তা এবং পরোপকারী মনোভাবের কারণে তিনি বন্ধুদের নিকট খুবই প্রিয় ছিলেন। তিনি ভাল ভজনও গাইতে পারতেন। হরিচাঁদ বাল্যকাল থেকেই ছিলেন ভাবুক প্রকৃতির; বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। তাঁর আধ্যাত্মিক মহিমা সম্পর্কে অনেক কিংবদন্তি আছে। এমনও বলা হয় যে,

তিনি আধ্যাত্মিক শক্তিবলে মানুষের রোগমুক্তি ঘটাতে পারতেন। তিনি চৈতন্যদেবের প্রেম-ভক্তির কথা সহজ-সরলভাবে প্রচার করতেন। তাঁর এই সাধন পদ্ধতিকে বলা হয় 'মতুয়াবাদ', আর এই আদর্শে যারা বিশ্বাসী তাদের বলা হয় 'মতুয়া'।

মতুয়াবাদ সত্য, প্রেম ও পবিত্রতা এই তিনটি মূল স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ মতবাদে সকল মানুষ সমান; জাতিভেদ বা সম্প্রদায়ভেদ মতুয়াবাদে স্বীকৃত নয়। হরিচাঁদ নিজে ব্রাহ্মণ-সন্তান হয়েও সমাজের নিম্নস্তরের লোকদেরই বেশি করে কাছে টেনেছেন; তাদের যথার্থ সামাজিক মর্যাদা দিয়েছেন। তাই দেখা যায়, তাঁর শিষ্যদের সিংহভাগই সমাজের নিম্নশ্রেণির লোক। তারা তাঁকে বিষ্ণুর অবতার বলে মনে করে। হরিচাঁদ সন্ন্যাস-জীবনে বিশ্বাসী ছিলেন না; তিনি ছিলেন সংসারী এবং সংসারধর্ম পালন করেই তিনি ঈশ্বরপ্রেমের বাণী প্রচার করেছেন। তাঁর ধর্মসাধনার মূলকথা হলো: "গৃহেতে থাকিয়া যার হয় ভাবোদয়।/ সেই যে পরম সাধু জানিও নিশ্চয়।।" তিনি এদেশের অবহেলিত সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ এবং সনাতন ধর্মে একনিষ্ঠ থাকার প্রেরণা জুগিয়েছেন।

হরিচাঁদ ১২৮৪ বঙ্গাব্দের (১৮৭৭) ২৩ ফাল্গুন বুধবার ইহলীলা সংবরণ করেন। তাঁর জীবন ও আদর্শ নিয়ে কবিয়াল তারকচন্দ্র সরকার *শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত* গ্রন্থ রচনা করেন। ঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে প্রতি বছর ওড়াকান্দিতে দেশ-বিদেশের মতুয়ারা সম্মিলিত হন এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

চৈত্রসংক্রান্তি

চৈত্রসংক্রান্তি প্রধানত হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি উৎসব। বাংলা সনের শেষ দিনটিকে বলা হয় সংক্রান্তি। এদিন মূলত পুরাতন বৎসরকে বিদায় জানানো হয়। একটি লোকউৎসব হিসেবে এতে ধর্মীয় উপাদানের সঙ্গে সামাজিক কিছু আচারও মিশে গেছে। হিন্দু শাস্ত্র ও লোকাচার অনুসারে এই দিনে স্নান, দান, ব্রত, উপবাস প্রভৃতি ক্রিয়াকর্মকে পুণ্যজনক বলে মনে করা হয়। চৈত্রসংক্রান্তির প্রধান উৎসব চড়ক। এর সঙ্গে চলে গাজনের মেলা। গোটা চৈত্রমাস জুড়ে উপবাস, ভিক্ষান্নভোজন প্রভৃতি নিয়ম পালন করার পর সংক্রান্তির দিন সন্ন্যাসীরা বা সাধারণ লোকেরা শূলফোঁড়া, বাণফোঁড়া ও বড়শিগাঁথা অবস্থায় চড়কগাছে (উঁচু করে পোঁতা কাঠে) ঘোরা, আগুনে হাঁটা প্রভৃতি সব ভয়ঙ্কর ও কষ্টসাধ্য দৈহিক কলা-কৌশল দেখায়। অবশ্য বর্তমানে এ ধরনের খেলা অনেক কমে এসেছে।

অতীতে এই লোকউৎসব উপলক্ষ্যে গ্রামাঞ্চলের গৃহস্থবাড়িতে আত্মীয় সমাগম ও আনন্দানুষ্ঠান হতো। এখন এই প্রথা নেই বললেই চলে। বর্তমানে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বৈশাখী মেলা নামে এই মেলার আয়োজন করা হয়।

শুভ মহালয়া

মহালয়া হিন্দুদের একটি ধর্মীয় উৎসব। এর মধ্যে একাধিক ধর্মীয় কৃত্যের সমন্বয়ে ঘটেছে। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এ শুক্লপক্ষকে বলা হয় দেবীপক্ষ। আর এ দেবীপক্ষের অর্থাৎ আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের ঠিক আগের কৃষ্ণপক্ষকে বলা হয় পিতৃপক্ষ বা অপরপক্ষ। অপরপক্ষের অমাবস্যা তিথিকে বলা হয় মহালয়া। বাংলায় মহালয়ার দিন দুর্গাপূজার সূচনা হয়। দুর্গাপূজার সাতদিন পূর্বে মহালয়া অনুষ্ঠিত হয়। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী, এইদিন দেবী দুর্গা মর্ত্যলোকে আবির্ভূতা হন। তাই মহালয়া দুর্গাপূজার আগমনী উৎসব। মহালয়া এসে ঘোষণা দেয়, মা দুর্গা আসছেন।

মহালয়ার দিন প্রত্যুষে চণ্ডীপাঠ করা হয়। অন্যদিকে এ মহালয়া প্রয়াত পূর্বপুরুষদের স্মরণ করে, তাঁদের শ্রদ্ধা জানানোর তিথি। এ তিথিতে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রয়াত পূর্বপুরুষদের শ্রদ্ধা জানানো হয়। ধর্মীয় আচার বা রীতি মেনে পূর্বপুরুষদের আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে গঙ্গার ধারে স্মৃতি-তর্পণ ও পিণ্ডদান করা হয়। অর্থাৎ সকৃতজ্ঞ চিত্তে পূর্বপুরুষদের স্মরণ এবং দেবী দুর্গার আগমনী ঘোষণা মহালয়ার মূল উদ্দেশ্য। এর মধ্য দিয়ে ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়। আর ধর্মীয় উৎসবের আয়োজন যে সাংস্কৃতিক ধারা তাকেও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

মহালয়া উপলক্ষ্যে সংগীতানুষ্ঠান, আলোচনা সভা প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশন মহালয়া উপলক্ষ্যে বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে। দিনটিতে হিন্দু ধর্মীয় পার্বণ হিসাবে ঐচ্ছিক ছুটি থাকে।

শ্রী শ্রী লক্ষ্মীপূজা

লক্ষ্মীপূজা হিন্দুদের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব। লক্ষ্মী সম্পদ, সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্যের দেবীরূপে পূজিতা হন। ঋগ্বেদে শ্রী ও ঐশ্বর্যের দেবী অর্থে লক্ষ্মীর নাম পাওয়া যায়। ঐত্তিরীয়সংহিতায় লক্ষ্মী ও শ্রী আদিত্যের দুই স্ত্রীরূপে কল্পিত; শতপথব্রাহ্মণে প্রজাপতি থেকে এবং রামায়ণে সমুদ্রমন্থনের সময় পদ্মহস্তে তিনি উত্থিত হন বলে বর্ণিত হয়েছে। দেবী লক্ষ্মী কখনো বিষ্ণুশক্তি লক্ষ্মী, আবার কখনো কমলা, গজলক্ষ্মী, মহালক্ষ্মী ইত্যাদি নামে পরিচিত। লক্ষ্মীদেবীর রূপবৈচিত্র্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তিনি কখনো দ্বিভুজা, কখনো-বা চতুর্ভুজা। তবে তিনি সর্বত্রই পদ্মাসনা ও পদ্মহস্তা; প্রভাত সূর্যের ন্যায় তাঁর জ্যোতি। তিনি বিভিন্ন অলঙ্কারে অলঙ্কৃত এবং তাঁর বাহন পেঁচক।

দুর্গাপূজার অব্যবহিত পরবর্তী পূর্ণিমা তিথি অর্থাৎ আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের পূর্ণিমা তিথি লক্ষ্মীপূজার জন্য অতি প্রশস্ত সময়। এদিন রাতে দেবী মর্ত্যবাসীদের দ্বারে দ্বারে এসে আশীর্বাদ দিয়ে যান। রাতে জেগে থেকে রাতব্যাপী দেবীর ধ্যান-আরাধনায় মগ্ন থাকলে ভক্ত তাঁর অনুগ্রহ লাভ করেন বলে মনে করা হয়; আর ভক্তরা বিনিদ্র থেকে লক্ষ্মীর পূজা করে বলে এ রাতকে বলা হয় কোজাগরী পূর্ণিমা বা কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা। এছাড়া প্রতি বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীপূজা করা হয়।

লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষ্যে বাড়ি-ঘরে বিভিন্ন রকম আল্পনা আঁকা হয়; বিশেষ করে ঘরের দরজা থেকে শুরু করে লক্ষ্মীর আসন এবং ধান-চালের গোলা পর্যন্ত ছোট ছোট পায়ের ছাপ দেওয়া হয়। এটি লক্ষ্মীর গমনপথের প্রতীকরূপে কল্পিত। পূজান্তে ভক্তরা প্রসাদ খায়; অঞ্চলভেদে নারকেল (বিশেষত নারকেলের জল) এবং নাড়ু-চিড়া খেয়ে সারারাত লক্ষ্মীর পাঁচালি পাঠ ও আনন্দফূর্তি করে থাকে।

শ্রী শ্রী শ্যামাপূজা

শ্যামাপূজা বা কালীপূজা হিন্দু বিশেষত শাক্ত সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব। কালী হচ্ছেন দশ মহাবিদ্যার প্রথম মহাবিদ্যা। তাঁর সম্বন্ধে নানা পুরাণ ও তন্ত্রে বহু তথ্য আছে। তাঁর বর্ণনা মোটামুটি এরূপ: চতুর্ভুজা, করালবদনা, মেঘকৃষ্ণবর্ণা, মুণ্ডমালিনী, মুণ্ডসমূহ থেকে নিঃসৃত রক্তধারায় রঞ্জিতা, ত্রিনয়না, শিববক্ষোপরি দণ্ডায়মানা এবং শিবাকুলবেষ্টিতা। তাঁর চতুর্ভুজের দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে থাকে খট্বাঙ্গ ও চন্দ্রহাস এবং বাম হস্তদ্বয়ে থাকে বর্ম ও পাশ; আর পরিধানে থাকে ব্যাঘ্রচর্ম। দেবী কালী বা শ্যামা দুর্গা দেবীর মতো শক্তির দেবী। তিনি অসুর বিনাশে ভয়ঙ্করী। পৃথিবীর সকল অন্যায় ও অত্যাচার দূর করার জন্য দেবী কালী অশুভ শক্তিকে ধ্বংস করেন। কালী ভগবান শিবের সহধর্মিণী এবং বিশেষ দেহকোষ থেকে দেবী কৌষিকী আবির্ভূত হন। তখন ভগবতীদেবী কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেন বলে তাঁর নাম হয় কালী বা কালিকা। তিনি শুম্ভ-নিশুম্ভ নামে দুই দানবকে বধ করেন। তাদেরই দুই চেলা চণ্ড ও মুণ্ডকে বধ করায় দেবীর আর এক নাম হয় চামুণ্ডা।

শ্যামাপূজা বা কালীপূজা সাধারণত অমাবস্যার রাতে করা হয়। কালীপূজা দুর্গাপূজার পর কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসের অমাবস্যা তিথিতে অনুষ্ঠিত হয়। পূজার দিন সন্ধ্যার সময় দীপাবলির আয়োজন করা হয় যা দেয়ালী নামে পরিচিত। বিভিন্ন ধরনের মহামারীর (বসন্ত, কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব, ঝড়, বন্যা, খরা প্রভৃতির) সময় রক্ষা কালী বা শ্যামা কালীর পূজা করা হয়। দেবী কালী অন্যায় প্রতিরোধ করে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তাঁর ভক্তদের কল্যাণে নিয়োজিত। অন্যায়কারীদের কাছে দেবী রাগী, ভয়ংকরী, ভক্তের কাছে স্নেহময়ী জননী।

ঐচ্ছিক ছুটি (খ্রিষ্টান পর্ব)

ইস্টার সানডে

ইস্টার সানডে

ইস্টার সানডে হলো খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের একটি ধর্মীয় উৎসব। নিউ টেস্টামেন্টের বর্ণনা অনুযায়ী যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করার পরে, তৃতীয় দিন অর্থাৎ রবিবার তিনি ক্যালভারিতে পুনরুত্থান করেন। যিশুর পুনরুত্থানের ঘটনাকে স্মরণ করার জন্য খ্রিষ্টানগণ এ দিবসটিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করে। চল্লিশ দিনব্যাপী উপবাস, প্রার্থনা এবং অনুশোচনার মাধ্যমে ইস্টার পালন করা হয়। চল্লিশ দিনব্যাপী উপবাসের শেষ সপ্তাহকে বলা হয় পুণ্য সপ্তাহ।

ঐচ্ছিক ছুটি (বৌদ্ধ পর্ব)

মাঘী পূর্ণিমা
আষাঢ়ী পূর্ণিমা
মধু পূর্ণিমা (ভাদ্র পূর্ণিমা)
প্রবারণা পূর্ণিমা (আশ্বিনী পূর্ণিমা)

মাঘী পূর্ণিমা

মাঘী পূর্ণিমা বৌদ্ধদের একটি ধর্মীয় উৎসব। এদিন বুদ্ধদেব তাঁর পরিনির্বাণের (মৃত্যুর) কথা ঘোষণা করেন। কথিত আছে যে, বুদ্ধের এরূপ সংকল্প গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ ভীষণ ভূকম্পন শুরু হয়। ভিক্ষুগণ এর কারণ জানতে চাইলে বুদ্ধ বলেন, তাঁর পরিনির্বাণের সঙ্কল্পের কারণেই এরূপ হয়েছে; অর্থাৎ তথাগতের জন্ম, মৃত্যু ও বুদ্ধত্ব লাভ কালে জগৎ এমনিভাবে আলোড়িত হয়।

বুদ্ধের পরিনির্বাণের কথা শুনে উপস্থিত ভিক্ষুরা বিষণ্ন ও শোকাভিভূত হলে বুদ্ধ তাঁদের বলেন, 'মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, এজন্য দুঃখ করা অনুচিত। তোমরা সংকল্পবদ্ধ ও দৃঢ়চিত্ত হয়ে ধর্মচর্চা কর, তবেই জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর এই সংসার উত্তীর্ণ হয়ে দুঃখকে জয় করতে পারবে।' অর্থাৎ এই দিনটির তাৎপর্য হলো, আত্মশক্তির উন্নয়ন এবং সকল প্রকার ক্লেশ বিনাশপূর্বক কল্যাণময় নির্বাণ লাভের সামর্থ্য অর্জন। এ দিনটির আরও একটি শিক্ষা হলো, মানুষ যদি আধ্যাত্মিক সাধনায় পূর্ণতা লাভ করে তাহলে সে নিজের জীবন-মৃত্যুকেও নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়।

এদিন প্রতিটি বিহারে বুদ্ধপূজা, শীলগ্রহণ, ভিক্ষুসংঘকে পিন্ডদান, প্রদীপপূজা, অনিত্যভাবনা ও ধর্মীয় সভার আয়োজন করা হয়। দিনটি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

আষাঢ়ী পূর্ণিমা

আষাঢ়ী পূর্ণিমা বৌদ্ধদের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব। গৌতম বুদ্ধের জীবনের তিনটি ঐতিহাসিক ঘটনা আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে সংঘটিত হয়েছিল। এদিন তিনি মাতৃগর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেন, যৌবনে স্ত্রীপুত্রের মায়া, রাজ্য ক্ষমতা ও বিত্তবৈভব বিসর্জন দিয়ে গৃহত্যাগ করেন এবং বুদ্ধত্ব লাভের পর প্রথম ধর্মবাণী প্রচার করেন। বুদ্ধের প্রচারিত প্রথম ধর্মবাণীকে বলা হয় 'ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র'। এ ছাড়া এ পূর্ণিমা তিথিতে তিনি যমক ঋদ্ধি (দিব্যশক্তি) প্রদর্শন করেন এবং ভিক্ষুগণকে আত্মবিশুদ্ধি ও আত্মবিশ্লেষণাত্মক চেতনায় উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে বর্ষাব্রত পালনের নির্দেশ দেন। এদিন বুদ্ধদেব বারাণসীতে মহানাম, অশ্বজিৎ, বপ্প, ভদ্রিয় ও কোন্ডষা এ পাঁচজনকে তাঁর অর্জিত সিদ্ধিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। জগতে বুদ্ধবাণীর প্রথম প্রকাশ ঘটে এদিনই। তাই ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আষাঢ়ী পূর্ণিমা বিশেষ গুরুত্ববহ।

আষাঢ়ী পূর্ণিমার শিক্ষাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: সাধনা ও কর্মপ্রচেষ্টায় সফলতা ছাড়া বিফলতা নেই; বিষয়-আসক্তিতে কীর্তি, খ্যাতি এবং মানসিক ও শারীরিক শান্তি নেই; ত্যাগেই শান্তি, ত্যাগেই মহত্ত্ব, ত্যাগেই মুক্তি এবং ত্যাগেই নির্বাণ। জীবনে ত্যাগের চর্চা অত্যন্ত কঠিন। তাই ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় ত্যাগের এ শক্তি ও

যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। একবার অর্জিত হলে সে ত্যাগচেতনা অনন্ত জীবনের অফুরন্ত সম্পদে পরিণত হয়। বুদ্ধও তাঁর জাগতিক সম্পদ, রাজ্য, স্ত্রীপুত্র পরিত্যাগ করে অনন্ত জগতের অধীশ্বর হতে সক্ষম হয়েছিলেন। এদিন বিহারে বিহারে পূজা-অর্চনাসহ নানা ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বৌদ্ধ উপাসক-উপাসিকারা এদিন উপবাসব্রত গ্রহণ করেন।

মধু পূর্ণিমা (ভাদ্র পূর্ণিমা)

মধু পূর্ণিমা বৌদ্ধদের একটি ধর্মীয় উৎসব। পারিল্যেয়ক বনে অবস্থানকালে বুদ্ধের প্রতি বন্য প্রাণীদের সেবাপরায়ণতা ও সহযোগিতার স্মারক হিসেবে ভাদ্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এ উৎসব পালিত হয়। এর উদ্দেশ্য দানের মহিমা প্রচার করা। বুদ্ধদেব যখন পারিল্যেয়ক বনে দশম বর্ষাবাস ব্রত পালন করছিলেন, তখন একটি হাতি ও একটি বানর ভিক্ষা করা, ফলমূল সংগ্রহ করা, হিংস্র প্রাণীদের হাত থেকে আত্মরক্ষা ইত্যাদি কাজে বুদ্ধকে সব সময় সাহায্য করত। এভাবে তাদের সেবা পেয়ে বুদ্ধ নির্বিঘ্নে বর্ষাব্রত যাপন করছিলেন। একদিন বানরটি বুদ্ধকে একটি মৌচাক এনে দিলে তিনি তা থেকে মধু সংগ্রহ করেন। তা দেখে আনন্দচিত্ত সেই বানর গাছে গাছে লাফালাফি করতে গিয়ে মাটিতে পড়ে মৃত্যুবরণ করে। সেদিন ছিল ভাদ্র মাসের পূর্ণিমা তিথি। তাই মানবেতর একটি প্রাণীর দানের মহিমা স্মরণীয় করে রাখার জন্য এদিনটিকে ‘মধুপূর্ণিমা’ নামে আখ্যায়িত করা হয়।

দানের মহিমা প্রচার ছাড়া এ পূর্ণিমার আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলো পারস্পরিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা। কৌশাম্বীবাসী ভিক্ষুদের মধ্যে যে দ্বিধাবিভক্তি ছিল, তার অবসানে এদিন ভিক্ষুগণ পারিল্যেয়ক বনে গিয়ে বুদ্ধের নিকট ঐক্যমন্ত্রে দীক্ষিত হন। বুদ্ধ তাঁদের বললেন: এই হাতি তার উপযুক্ত সঙ্গী না পেয়ে একাকী বনে বাস করছে। প্রজ্ঞাবান ও উচ্চমার্গের সঙ্গী না পেলে জগতে একাকী অবস্থান করাই শ্রেয়, কারণ মূর্খ সঙ্গী দুর্ভোগ বাড়ায়।

মধুপূর্ণিমার শিক্ষা হলো দান, সেবা ও একতা সমাজজীবনে যেমন, তেমনি আরণ্যজীবনেও অপরিহার্য। ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য পারস্পরিক সহিষ্ণুতার প্রয়োজন। দান-সেবা শুধু মানুষের জীবনে নয়, মানবেতর প্রাণীর জীবনেও পরিবর্তন আনে। তাই সর্বদা মৈত্রী, করুণা ও ত্যাগের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পারস্পরিক কল্যাণবোধের মানসিকতা নিয়ে জীবন অতিবাহিত করা উচিত। এতে সকলের কল্যাণ হয়। এদিন বৌদ্ধ উপাসক-উপাসিকা ও আবালবৃদ্ধবণিতা মধু দিয়ে বুদ্ধপূজা করে এবং ভিক্ষুগণকে মধু দান করে। সকল বৌদ্ধবিহারে এদিন আনন্দঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

প্রবারণা পূর্ণিমা (আশ্বিনী পূর্ণিমা)

প্রবারণা পূর্ণিমা বৌদ্ধদের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব। এর অপর নাম আশ্বিনী পূর্ণিমা। 'প্রবারণা' শব্দের অর্থ প্রকৃষ্টরূপে বরণ করা, নিষেধ করা ইত্যাদি। 'বরণ করা' অর্থে বিশুদ্ধ বিনয়াচারে জীবন পরিচালিত করার আদর্শে ব্রতী হওয়া, আর 'নিষেধ' অর্থে আদর্শ ও ধর্মাচারের পরিপন্থী কর্মসমূহ পরিহার করাকে বোঝায়। এদিন ত্রৈমাসিক বর্ষাবাস সমাপ্তিতে ভিক্ষুগণ আপন আপন দোষত্রুটি অপর ভিক্ষুগণের নিকট প্রকাশ করে তার প্রায়শ্চিত্ত বিধানের আহবান জানায়। এমনকি অজ্ঞাতসারে কোনো অপরাধ হয়ে থাকলে তার জন্যও ক্ষমা প্রার্থনা করে। অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনাচারের প্রতিটি মুহূর্তে সচেতনভাবে ঘটিতব্য সর্ববিধ দোষকে বর্জন করে গুণের প্রতি আকৃষ্ট থাকার চেতনা সৃষ্টি করাই প্রবারণার উদ্দেশ্য। শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থানকালে গৌতম বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘের পালনীয় হিসেবে এর প্রবর্তন করেন।

আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে প্রবারণা পালিত হয়। প্রবারণার পর ভিক্ষুসংঘকে অধীত জ্ঞান প্রচারের জন্য গ্রামে-গঞ্জে যেতে হয়। এ সময় তাঁরা কল্যাণের বাণী প্রচার করেন, যাতে দেব-মনুষ্যসহ সব প্রাণীর কল্যাণ সাধিত হয়। এভাবে প্রবারণা শেষ হওয়ার পর প্রতিটি বৌদ্ধবিহারে পালিত হয় কঠিন চীবর দান উৎসব।

প্রবারণা পূর্ণিমার অন্য একটি বর্ণিল দিক হলো ফানুস উত্তোলন। বৌদ্ধশাস্ত্রমতে বুদ্ধদেব আধ্যাত্মিক শক্তিবলে দেবলোকে গিয়ে মাকে ধর্মদেশনা করে এদিন স্বর্গ থেকে মর্ত্যে অবতরণ করেন। এ কারণে বৌদ্ধগণ প্রবারণা পূর্ণিমায় আকাশে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের প্রতীকরূপে ফানুস উত্তোলন করে। এ সংক্রান্ত আরেকটি কাহিনী হলো: সিদ্ধার্থ গৌতম কোনো এক সময় মাথার এক গুচ্ছ চুল কেটে বলেছিলেন তিনি যদি সিদ্ধিলাভের উপযুক্ত হন তাহলে এই কর্তিত চুল যেন নিম্নে পতিত না হয়ে উর্ধ্বে উঠে যায়। তাঁর ইচ্ছানুযায়ী কেশগুচ্ছ আকাশে উঠে গিয়েছিল। তাই বুদ্ধের কেশধাতু পূজার স্মৃতিস্বরূপ আকাশে এই ফানুস ওড়ানো হয়। এ করণে আত্মবিশ্লেষণের শিক্ষা, মাতৃকর্তব্য পালন ও বিনয়বিধান অনুশীলনের বহুবিধ মহিমায় এই প্রবারণা পূর্ণিমা মহিমান্বিত। প্রতি বছর আশ্বিনী পূর্ণিমায় বৌদ্ধরা শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে প্রবারণা পূর্ণিমা পালন করে। এ উপলক্ষ্যে আয়োজন করা হয় বুদ্ধপূজাসহ নানা পুণ্যানুষ্ঠানের। বাঙালি বৌদ্ধদের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এ পূর্ণিমার আবেদন খুবই গভীর।

ঐচ্ছিক ছুটি (পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জন্য)

বৈসাবি উৎসব

বৈসাবি উৎসব

বৈসাবি বাংলাদেশের তিনটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বর্ষবরণ উৎসব। বর্ষবরণ উৎসবকে ত্রিপুরারা বৈসু, মারমারা সাংগ্রাই ও চাকমারা বিজু বলে অভিহিত করে, এই তিন নামের আদ্যাক্ষর নিয়ে বৈসাবি নামের উৎপত্তি। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পুরনো বছরের কালিমা আর জীর্ণতাকে ধুয়ে নতুন বছরকে বরণ করে নেয় তারা। সাধারণত বছরের শেষ দুইদিন এবং নতুন বছরের প্রথম দিন বর্ষবরণ উৎসব বৈসাবি পালিত হয় বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায়।

বৈসু উৎসব ত্রিপুরাদের সবচেয়ে বড় উৎসব। বৈসু উৎসব একটানা তিন দিন পালন করা হয়। বৈসু উৎসবের প্রথম দিন হারি বৈসু। এই দিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে তারা ঘরদোর লেপেপোঁছে, বসতবাড়ি কাপড়চোপড় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে, বিশেষ একপ্রকার গাছের পাতার রস আর হলুদের রস মিশিয়ে গোসল করে। ফুল দিয়ে ঘরবাড়ি সাজায়। দেবতার নামে নদীতে বা ঝর্ণায় ফুল ছিটিয়ে খুমকামীং পূজা দেয়। কেউ কেউ পুষ্পপূজা করে। এদিন মহিলারা বিন্নি চাউলের পিঠা ও চোলাই মদ তৈরি করে। পুরুষেরা বাঁশ ও বেত শিল্পের প্রতিযোগিতা ও খেলাধুলায় মেতে উঠে। হারি বৈসু উৎসবের দিন থেকে এরা গরয়া নৃত্য পরিবেশন শুরু করে। এ নৃত্য সাত দিন থেকে আটাশ দিন পর্যন্ত চলে। নাচ শেষে গরয়া পূজার ব্যবস্থা করা হয়। উৎসবের দ্বিতীয় দিন বিসুমাতে ত্রিপুরারা নববর্ষকে স্বাগত জানায়, ধূপ, চন্দন ও প্রদীপ জ্বেলে পূজা দেয় ও উপাসনা করে। সবাই গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে বেড়ায়। বাড়ি বাড়ি গিয়ে পাচন, সেমাই ও মিষ্টি খায়। এছাড়া এদিন তারা নিরামিষ ভোজন করে। কোনো প্রাণী বধ করে না। অনুষ্ঠানের তৃতীয় দিন বিসিকাতালে আমিষ খাবার গ্রহণে বাধা নেই। এদিনও ফুল দেওয়া হয় ও উপাসনা করা হয়। তারা বয়োজ্যেষ্ঠদের গোসল করিয়ে পায়ের কাছে পূজার নৈবেদ্য হিসেবে ফুল রাখে এবং প্রণাম করে।

মারমারা পুরাতন বছরকে বিদায় জানিয়ে নতুন বছরকে বরণ করার উৎসবকে সাংগ্রাই উৎসব বলে। তারা বৈশাখের প্রথম দিনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে পালন করে বাংলা নববর্ষ। পাচন, পিঠা এবং নানা মুখরোচক খাবারের আয়োজন করে মারমা জনগোষ্ঠী। সবাই নতুন পোশাক পরে, একে অপরের বাড়ি যায় এবং কুশল বিনিময় করে। সব বয়সের নারীপুরুষ সম্মিলিতভাবে নাচ আর গানে মেতে উঠে। মারমা বৃদ্ধরা অষ্টশীল পালনের জন্য মন্দিরে যায়। মারমা জনগোষ্ঠীর এ দিনের প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে জল অনুষ্ঠান বা পানি খেলা। মারমা ভাষায় জল অনুষ্ঠানকে বলা হয় রিলংপোয়ে। পানিকে পবিত্রতার প্রতীক ধরে নিয়ে মারমা তরুণতরুণীরা পানি ছিটিয়ে নিজেদের শুদ্ধ করে নেয়।

চাকমাদের বর্ষবরণ উৎসব হলো বিজু। তারা চৈত্র মাসের ২৯ তারিখে ফুল বিজু, ৩০ তারিখে মূল বিজু এবং বৈশাখের প্রথম দিনে গজ্যাপজ্যা বিজু নামে অনুষ্ঠান পালন করে। ফুল বিজুর দিন গভীর অরণ্য থেকে ফুল সংগ্রহ করে। সেই ফুল দিয়ে তারা ঘরবাড়ি সাজায়, বুদ্ধের উদ্দেশে উৎসর্গ করে, নদী বা পুকুরের পাড়ে তৈরি পূজামন্ডপে রেখে প্রার্থনা করে এবং প্রিয়জনকে উপহার দেয়। মূল বিজুর দিনে অসংখ্য কাঁচা তরকারি সংমিশ্রণে ঘণ্ট তৈরি করা হয়। এছাড়া পায়েস ও নানা ধরনের পিঠা তৈরি করা হয়। এই দিনে চাকমারা ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরিধান করে র‍্যালিতে যোগ দেয়, অবালবৃদ্ধবনিতা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ায় এবং আনন্দ করে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িঘর, উঠান ও গোশালায় প্রদীপ জ্বালিয়ে সবার মঙ্গল কামনা করা হয়। মন্দিরে গিয়ে মোম জ্বালিয়ে ফুল দিয়ে বুদ্ধের পূজা করা হয়। গজ্যাপজ্যা অনুষ্ঠিত হয় নববর্ষের প্রথম দিনে। এদিন চাকমারা বিশ্রাম করে, বড়দের স্নান করিয়ে দিয়ে আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। বৌদ্ধবিহারে গিয়ে প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করে।

তথ্য-উৎস :

১. বাংলাদেশের জাতীয় জ্ঞানকোষ *বাংলাপিডিয়া* (অনলাইন সংস্করণ), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা

২. অনলাইন মুক্ত বিশ্বকোষ *উইকিপিডিয়া*

৩. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ